মহাপুরুষ

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অনুধ্যান

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক
সম্পাদিত

মহেন্দ্র পাব্‌লিশিং কমিটী
৩, গৌরমোহন মুখার্জ্জী ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।

প্রকাশক—
শ্রীপ্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়
৩, গৌরমোহন মুখার্জ্জী ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান—

প্রকাশকের নিকট—৩, গৌরমোহন মুখার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীযুক্ত পি, মুখার্জ্জী—১৪, কাঁকুড়গাছি সেকেণ্ড লেন, কলিকাতা।
ডায়মণ্ড প্রিণ্টিং হাউস—৭১।এ, দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
দাসগুপ্ত এণ্ড কোং—৫৩।৪, কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
বরেন্দ্র লাইব্রেরী—২০৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
নাথ ব্রাদার্স—২৩।সি, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
শ্রীগুরু লাইব্রেরী—২০৩, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
শ্রীযুক্ত এস সি, দত্ত—৪৩, বেণ্টিক ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
শ্রীযুক্ত তারকনাথ মিত্র—১৫, ষষ্ঠীতলা রোড়, নারিকেলডাঙ্গা।

প্রিণ্টার—
শ্রীবলাই চরণ ঘোষ
ডায়মণ্ড প্রিণ্টিং হাউস
৭১।এ দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট,, কলিকাতা

মূল্য ১৲ টাকা]

উৎসর্গ

শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের যিনি বিশেষ বশম্বদ ছিলেন,
যিনি স্বামীজির আদেশ কার্য্যে প্রতিপালনার্থে
সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন,
যিনি রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম প্রাণস্বরূপ,

সেই

মহাত্মা শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দের
পুণ্য স্মৃতিরক্ষাকল্পে
এই গ্রন্থখানি উৎসর্গীকৃত হইল।

প্রকাশকের নিবেদন

ব্রহ্মচারী প্রাণেশকুমার, শ্রীযুক্ত যতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ, কাব্যসাংখ্যতীর্থ, শ্রীযুক্তা চারুবালা মিত্র, শ্রীযুক্তা নলিনা সিংহ, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ মিশ্র, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মিশ্র, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মল্লিক, শ্রীযুক্ত নিরঞ্জনকুমার হাজরা, শ্রীযুক্ত তারকনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত হিমাংশুকুমার বসু, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ সিংহ, শ্রীযুক্ত সত্যচরণ দত্ত, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ নাগ, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রকুমার সিংহ প্রভৃতি মহোদয়-মহোদয়াগণের আন্তরিক সম্মিলিত চেষ্টা ও সাহায্য ব্যতীত এই গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভবপর হইত না। তাঁহাদের প্রত্যেককেই অন্তরের সহিত কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

"উদ্বোধন" কার্য্যালয়ের পূজনীয় স্বামী আত্মবোধানন্দ এই গ্রন্থের প্রচ্ছদপট ও ছবিগুলির "ব্লক" ব্যবহার করিবার ও ছাপাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া অশেষ উপকার করিয়াছেন। তাঁহাকে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ প্রণাম জানাইতেছি। শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কসে'র কর্তৃপক্ষ গ্রন্থের প্রচ্ছদপট ও ছবিগুলি নাম মাত্র মূল্যে ছাপাইয়া দিয়া বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাইতেছি। ডায়মণ্ড প্রিন্টিং হাউসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বলাইচরণ ঘোষ মহাশয় অনেক ক্ষতি স্বীকারপূর্ব্বক এই গ্রন্থখানি ছাপাইবার সুবিধাজনক ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার নিকটও আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ।

এতদ্ব্যতীত যে সকল সহৃদয় মহোদয়-মহোদয়াগণের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও উৎসাহ পাইয়া এই গ্রন্থ প্রকাশন নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল তাঁহাদেরও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

১লা জানুয়ারী ১৯৩৫ খৃঃ। — ইতি—

৩, গৌরমোহন মুখার্জ্জী ষ্ট্রীট্, — নিবেদক

কলিকাতা। — শ্রীপ্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়।

গ্রন্থারম্ভ—১৩ই ফাল্গুন, রবিবার, সন ১৩৪০।
গ্রন্থ সমাপ্তি—৭ই চৈত্র, বুধবার, সন ১৩৪০।

লিপিকার—শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বসু।
অনু-লিপিকার—শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মিত্র।

গ্রন্থ মুদ্রণ—১৩ই বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, সন ১৩৪১
গ্রন্থ প্রকাশ—১৬ই পৌষ, মঙ্গলবার, সন ১৩৪১।

পরিচয়

গত বৎসর ফাল্গুন মাসে, মহাপুরুষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দের তিরোধানে তাঁহার শিষ্য, ভক্ত ও গুণমুগ্ধ সকলেই বিশেষ মর্ম্মাহত ও শোকাভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা, পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়, সেই সময় একদিন মহাপুরুষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দের কতিপয় শিষ্য, ভক্ত ও গুণমুগ্ধজনের নিকট অতীব বিমর্ষ চিত্তে ও আবেগভরে তাঁহার জীবনের অনেক পূর্ব্বকথা বলিতেছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে তাঁহারা তাঁহাকে মহাপুরুষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দের একটী জীবনী গ্রন্থ লিখিতে অনুরোধ করেন এবং তিনিও তাঁহার প্রতি নিজ আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিবার জন্য এই অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হন। পরম শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার প্রায় মাসাবধিকাল প্রত্যহ অপরাহ্ণে এই গ্রন্থনিবদ্ধ বিষয়গুলি ভাবাবেশে বক্তৃতা দিয়াছিলেন—লিপিকার তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

ভাগীরথীতীরে—মহাতীর্থ দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীমূলে বসিয়া ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব যে মহাধর্ম্মের বাণী জগতকে শুনাইয়াছিলেন - যুগাচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁহার গুরুভ্রাতাগণদ্বারা প্রতিষ্ঠিত 'রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন',—সেই মহাধর্ম্ম সাধনার ও প্রচারের কেন্দ্র। যে সকল মহাপুরুষগণ তাঁহাদের আজীবন কঠোর সাধনা এবং মহা ত্যাগ ও তপস্যার দ্বারা এই প্রতিষ্ঠানে প্রাণশক্তি সঞ্চার করিয়াছেন, মহাপুরুষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি কয়েকবৎসর যাবৎ 'রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের' অধ্যক্ষের পদেও আসীন ছিলেন। এই সে দিন পর্য্যন্ত তাঁহার মহা আকর্ষণীপূর্ণ প্রস্তরভেদী ভালবাসার মূর্ত্তি অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। শাস্ত্রে উল্লিখিত বিদেহ অবস্থা যে কি—যাঁহারা এই মহাপুরুষকে বহুকালব্যাপী রোগশয্যায় শায়িত বাক্‌হীন অবস্থায় দেখিয়াছেন, তাঁহারা উহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন। তিনি ছিলেন—দর্শনশাস্ত্রের নির্ব্বাক জীবন্ত মূর্ত্তি। কিরূপ মহাকৃচ্ছ্র সাধনা, কিরূপ অমানুষিক ত্যাগ ও তপস্যার ভিতর দিয়া এমন মহান্ জীবন গড়িয়া উঠিয়াছিল পরম শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার এই "অনুধ্যান"এ তাহারই আভাষ দিয়াছেন। মহাপুরুষ

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দের সহিত তিনি বিশেষ ঘনিষ্ঠতাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। তাঁহার জীবনের অনেক ঘটনার বিষয় তিনি প্রত্যক্ষদর্শী। অধিকন্তু, তিনি নিজে একজন শুভ্রবসনপরিহিত পরিব্রাজক সাধু; এই হেতু, তিনি মহাপুরুষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দের সাধকজীবনের অনেক চিত্র জীবন্তভাবে ফুটাইতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার বহুদর্শিতা ও বহুমুখী প্রতিভাও মহাপুরুষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দকে বহুবিধভাবে বুঝিবার ও জানিবার অনেক সুযোগ দিয়াছে। এই সকল কারণে তাঁহার এই "অনুধ্যান"এর বিশেষ গুরুত্ব আছে।

মহাপুরুষগণের জীবনী—পরম সম্পদ। তাঁহাদের জীবনী অনুধ্যান অশেষ কল্যাণপ্রদ। জীবদ্দশায় তাঁহাদের শক্তি বিশেষ প্রকটরূপ ধারণ করে সত্য; কিন্তু দেহান্ত হইলেও তাঁহাদের শক্তির প্রভাব কখনও বিলুপ্ত হয় না—তাহার প্রভাব আরও শতগুণ বৃদ্ধি পায়। তাঁহাদের জীবন—শক্তির অনন্ত উৎস। ভক্ত ও সাধুজন এই "মহাপুরুষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অনুধ্যান" পাঠে নিজ নিজ আদর্শ অভিমুখে চলিবার অফুরন্ত উৎসাহ ও প্রেরণা যে পাইবেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

পরম শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার তাঁহার এই প্রাচীন বয়সে বহুকষ্ট স্বীকার-পূর্ব্বক এই গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়া মহাপুরুষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দের শিষ্য, ভক্ত ও গুণমুগ্ধ সকলকেই অশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন এবং তিনি অপ্রত্যক্ষভাবে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের প্রথম জীবনের সাধনা ও তপস্যার একটী তথ্যপূর্ণ অধ্যায় লিখিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তজনের উপকার ও আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন।

পরিশেষে সুধী পাঠকপাঠিকাগণের নিকট নিবেদন এই যে, এই গ্রন্থ সম্পাদনায় যে ভ্রম ও ত্রুটী রহিয়া গেল তাহা যেন তাঁহারা নিজগুণে মার্জ্জনা করেন।

১৬ই পৌষ, সন ১৩৪১।

২৩ নং ষষ্ঠীতলা রোড,

নারিকেলডাঙ্গা, কলিকাতা।

বিনীত—

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বসু।

প্রাক্কথন

জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দের কতিপয় শিষ্য ও ভক্ত আমায় অনুরোধ করায় এবং আমার শ্রদ্ধা-ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত আমি এই গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়াছি। এইরূপ উচ্চ অবস্থার মহাপুরুষের মনোভাব বিবৃত করা অতীব দুরূহ এবং মাদৃশ সামান্য লোকের পক্ষে ইহা নিতান্ত সুকঠিন; কারণ আমি সমস্ত বিষয় জানি না; কেবল মাত্র সামান্য আংশিক বিষয় দেখিয়াছি এবং সেই সামান্য আংশিক ঘটনারও গূঢ়ভাব কিছুই উপলব্ধি করিতে পারি নাই। এই জন্য নানা বিষয়ে ভ্রম ও বিপরীত অর্থ হইবার সম্ভাবনা আছে। তবে জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ বহুকাল হইতেই আমাকে বিশেষ স্নেহ ও যত্ন করিতেন এবং আমিও তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতাম ও ভালবাসিতাম। এই সাহসে, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য মদীয় ক্ষুদ্র শক্তির দ্বারা রচিত যৎসামান্য পুষ্প উপহার তাঁহার চরণে অর্পণ করিলাম।

যদি অপর কয়েকজন, যাঁহারা প্রথম হইতেই তাঁহার সহিত ছিলেন, অনুগ্রহ করিয়া নিজ নিজ ভাব ও নিজ নিজ অভিজ্ঞতা হইতে চার পাঁচখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহা হইলে এই গ্রন্থের ত্রুটী, প্রমাদ ও পরিত্যক্ত অংশগুলি কিঞ্চিৎ পরিমাণে সংশোধিত ও পূর্ণ হইতে পারে এবং এইরূপ সব কয়েকখানি গ্রন্থ একত্রে পাঠ করিলে এই মহাপুরুষের উচ্চভাব ও অবস্থার কিঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যাইতে পারে।

এই গ্রন্থপাঠে যদি কোন ব্যক্তির এই জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি আসে তাহা হইলে আমি নিজেকে সার্থক জ্ঞান করিব। মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দের শিষ্য ও ভক্তমণ্ডলী যদি এই গ্রন্থপাঠে কিঞ্চিৎ আনন্দলাভ করেন তাহা হইলে আমার শ্রম সফল হয়। এই নিমিত্ত, আমি এই মহাপুরুষের ভক্তমণ্ডলীর নিকট করজোড়ে মিনতি করিতেছি যে, প্রমাদ, ভ্রান্তি, ত্রুটী ও অপূর্ণতা সমস্ত উপেক্ষা করিয়া যদি তাঁহারা এই মহাপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি করেন, তাহা হইলে আমি পরম কৃতার্থ হইব।

৩, গৌরমোহন মুখার্জ্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
মহাপুরুষজী'র জন্মতিথি,
১৬ই পৌষ, মঙ্গলবার, সন ১৩৪১।

বিনীত—
শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত

বাণী

"৺গঙ্গা পূজার চেয়ে মানুষ পূজা বড়।"

—স্বামী শিবানন্দ

মহাপুরুষ

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের

অনুধ্যান।

রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম প্রাণস্বরূপ মহাপুরুষ শিবানন্দ--

রামকৃষ্ণ মিশন যে প্রভূত শক্তি বিকাশ করিতেছে এবং ভবিষ্যতে আরও যে অসীম শক্তি বিকাশ করিবে, এই শক্তির প্রাণস্বরূপ যে কয়েকটী মহাপুরুষ জীবন উৎসর্গ করিয়া কঠোর তপস্যা করিয়া শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন, যাঁহাদিগের তপস্যা ও পুণ্যবলে জগতের ভাবস্রোত পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে, সেই কয়জন মহাপুরুষদিগের মধ্যে মহাপুরুষ শিবানন্দ অন্যতম। তাঁহার কঠোর তপস্যা ও উদার ভাবের বিষয় অনেকে জানিতে ইচ্ছা করেন এবং ভবিষ্যতে অনেকের মঙ্গল হইবে ও অনেককে সাধন পথ দেখাইয়া দিবে এই আশায় এই গ্রন্থে সেই মহাপুরুষ শিবানন্দের বিষয় কিঞ্চিন্মাত্র আলোচনা করিতেছি। তাঁহার কঠোর তপস্যার বিষয় অবর্ণনীয় এবং আমার এমন কোন সামর্থ্য

নাই বা অভিজ্ঞতা নাই, যাহাতে আমি তাঁহার তপস্যার সম্যক পর্য্যালোচনা করিতে পারি; কিন্তু এই মহাপুরুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে প্রণোদিত হইয়া আমি এস্থলে তাঁহার বিষয় কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিতেছি। অবশ্য তাঁহার বিষয় বহুমুখী ভাবে আমার জানা নাই; তবে, যৎসামান্য যাহা আমার জানা আছে, তাহাই প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছি।

তারক নাথ ঘোষাল—

ইংরাজী ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে সিমুলিয়া মধুরায়ের গলিতে রামদা'র বাড়ীতে একটী যুবককে দেখিলাম। দেহ কৃশ, বর্ণ উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, মুখে অল্প অল্প কোঁকড়ান দাড়ী। অতি ধীর, বিনয়ী, সর্ব্বদা হাস্যমুখ এবং চক্ষুদ্বয় অন্তর্দৃষ্টিতে পরিপূর্ণ যেন বহির্জ্জগত অতিক্রম করিয়া তিনি অন্তরের অন্তরে, অতি ঊর্দ্ধে, কোন বস্তু পাইতে প্রয়াস করিতেছেন। এইরূপ শান্ত প্রকৃতির যুবক হওয়ায় তিনি সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন। পরে জানিলাম ইহাঁর নাম তারকনাথ ঘোষাল, বাড়ী দমদম বারাসাত। পিতা আইনের ব্যবসা করেন। আরও শুনিলাম তাঁ'র পিতা দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের নিকট যাতায়াত করেন।

এইরূপে তারকনাথের সহিত আমার পরিচয় হয়। তারকনাথ এই সময় কোন অফিসে কাজ করিতেন এবং সর্ব্বদাই রামদা'র বাড়ীতে আসিতেন। সর্ব্বদা আসা যাওয়া করায় সিমলার অনেকের সহিত তাঁহার হৃদ্যতা হইয়াছিল এবং বয়সে

অনেকের চেয়ে অল্প হইলেও সকলেই তাঁহাকে একটু শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন।

তারকনাথ ও বংশ পরিচয়—

তারকনাথ বারাসাতের সম্ভ্রান্ত ঘোষাল বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। একদিন বেলুড়মঠে কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তারকদা, তোমার নাম তারকনাথ কেন?" তিনি একটু হাঁসিয়া বলিলেন, "বাপের প্রথম পুত্র সন্তান হয় নাই, সেইজন্য ৺তারকেশ্বরে মানস করিয়া পুত্র সন্তান হওয়ায় তারকনাথ নাম রাখিয়াছিলেন।" ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে আমি যখন কাশী যাই তখন তারকদার এক বৃদ্ধা ভগিনী অদ্বৈত আশ্রমে সর্ব্বদাই আসিতেন। তাঁহার কাছ থেকে বংশের বিষয় কিছু শুনিয়াছিলাম। এই ভগিনী ও তারকনাথ এক মাতার। তাঁহার পিতার দ্বিতীয় স্ত্রী হইতে এক সন্তান হইয়াছিল, তিনি তারকদার কনিষ্ঠ, তিনি মাঝে মাঝে বেলুড় মঠে আসিতেন। এতদ্ভিন্ন অপর কোন ভ্রাতা বা ভগিনী ছিল কি না আমার জানা নাই। তারকনাথ বিবাহ করিয়াছিলেন। গৃহত্যাগ করিয়া আসিবার কিছুদিন পরে তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ হয়, একথা আমি শুনিয়াছিলাম কিন্তু আবশ্যক বোধ না করায় আর অনুসন্ধান করি নাই।

রামদা'র বাড়ীতে পরমহংস মহাশয়ের আগমন—

পরমহংস মশায় তখন সর্ব্বদা সিমলাতে আসিতেন—কখনও

বা মনোমোহনদা'র বাড়ী (রাখাল মহারাজের শ্যালকের বাড়ী) কখনও বা সুরেশ মিত্রের বাড়ী ইত্যাদি। একদিন তিনি গোঁসাই বাড়ীতেও গিয়াছিলেন, কিন্তু রামদা'র বাড়ীতে তিনি প্রায়ই আসিতেন এবং তাঁহার আগমন উপলক্ষে অনেক লোক সমবেত হইতেন। এইরূপ লোক সমাগম হওয়ায় রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রথম অভ্যুদয় হয় ও ভবিষ্যতে ইহাই মহোৎসবের আদিকারণ হইয়াছিল অর্থাৎ এখন যে নানা স্থানে মহোৎসবাদি হইতেছে ইহা পরমহংস মশায়ের নিজের উপস্থিতি সময় হইতেই আরম্ভ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। রামদা'র বাড়ীতে শনিবার বা কোন পার্ব্বন উপলক্ষে পরমহংস মশায় দক্ষিণেশ্বর হইতে আসিতেন। অল্প সংখ্যা হইতে ক্রমে ক্রমে লোক সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। এমন কি তিন শত হইতে চারিশত পর্য্যন্ত লোক হইত এবং রাত্রে তাঁহারা সকলে প্রসাদ পাইতেন। তখনকার দিনে যে এত লোক পরমহংস মশায়ের নামে আসিতেন এটা খুব বেশী বলিয়াই ধরিতে হইবে, কারণ তখনকার দিনে জাতাজাতির বড় বিচার ছিল এবং নিমন্ত্রণ না করিলে অনেকে আবার আসিতেন না। প্রত্যেকেই মনে করিতেন যে, অপরের জাত গিয়াছে। তখন জাতি বিচারের কথা বিশেষ সমস্যার বিষয় ছিল ; বিশেষতঃ, সর্ব্বশ্রেণীর লোকের এক সঙ্গে বসে আহার করা, একটা অদ্ভুত ব্যাপার ! ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও অপর বর্ণ এক পংক্তিতে বসিয়া ভোজন করিতেছে ইহা এক গুরুতর সমস্যার বিষয়।

অন্য কোন বাড়ীতে এইরূপ চলিতে পারিত না, কিন্তু তখন পরমহংস মশায়ের প্রতি ধীরে ধীরে লোকের একটু শ্রদ্ধা ও ভক্তি হইতেছিল; সেইজন্য সকলে একত্রে আহার করিতে বিশেষ আপত্তি করিতেন না এবং সাধারণ লোকে সে কথা লইয়া বিশেষ চর্চ্চাও করিত না। এইটী হইতেছে পরমহংস মশায়ের সিমলাতে প্রথম বিকাশ বা সাধারণ লোকজনের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে একটু মেশামিশি করা। এইরূপে অল্প-সংখ্যক লোক তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন।

তারকনাথ এই সময়ে রামদা'র বাড়ীতে উৎসব উপলক্ষে আসিতেন এবং কিছুদিন ওখানে থাকায় তাঁর সহিত সকলেব অল্পবিস্তর পরিচয় হইয়াছিল।

নিত্য গোপালদা'র সঙ্গে মেশা—

নিত্যগোপালদা'র (অবধূত জ্ঞানানন্দ, যিনি মনোহরপুকুরে মহানির্ব্বাণ মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন) সে সময়ে খুব সাধন ভজন করিয়া উন্নত অবস্থা হইয়াছিল। সেই সময় সকলে তাঁহাকে এইরূপ বলিয়া স্বীকার করিতেন। যুবা তারকনাথ ঈশ্বরপিপাসু হইয়া কোন উন্নত অবস্থার লোকের সঙ্গলাভ করিবার মানসে নিত্যগোপালদা'র সহিত বিশেষ মেশামিশি করিতেন। এ স্থলে জানা আবশ্যক যে মনোমোহনদা, রামদা, নিত্যগোপালদা এই তিনজনেই পরস্পারের মাসতুতো ভাই। নিত্যগোপালদা

আবার তুলসীমহারাজের (স্বামী নির্ম্মলানন্দ) আপন মামা। এইজন্ত পরস্পরের একটা নিকট সম্বন্ধ ছিল।

ভাবের পরিবর্ত্তন—রামদার বাড়ীতে অবস্থান—

রামদা'র বাড়ীতে সিঁড়িতে উঠিয়া প্রথমে বাঁদিকে একটা কুঠরী ছিল। সেই ঘরটা রান্নাঘর করিবার উদ্দেশ্যে তৈয়ারী হইয়াছিল কিন্তু রান্নার ব্যবস্থা অন্য জায়গায় হওয়ায়, সেই ঘরটা খালি পড়ে থাকৃত। একদিন দেখি যে, তারকনাথ একটা ডোরাকাটা কম্বল গায়ে দিয়ে হাতের উপর মাথা রেখে স্থির হ'য়ে মেঝেতে শু'য়ে ধ্যান করিতেছেন। নিশ্চল পুরুষ! গরমী-কাল, দিনের বেলা কম্বল গায়ে দিয়ে পড়ে' থাকা—বিশেষতঃ, সেই হাওয়া বন্ধ কুঠরীটার ভিতর! কিন্তু তারকনাথ অন্যদিকে মন তুলিয়া সেই কুঠরীঘরের মেঝেতে শুইয়া জপ ধ্যান করিতেছিলেন। পরমহংস মশায়ের সঙ্গে সাক্ষাতের পর, বিশেষতঃ, নিত্যগোপালদা'র সহিত মেশামিশি হইতে, তিনি এখন আফিসের চাকরি ছাড়িয়া দিয়াছিলেন এবং কর্ম্মসঞ্চিত বিত্ত (Provident Fund) হইতে শ'পাঁচেক টাকা পাইয়া-ছিলেন। এইসময় তাঁহার পরিধানে একখানি কাপড়। কোঁচার দিকটা ঘুরিয়ে গায়ে দিতেন, পা খালি, গায়ে কম্বল, এবং সব সময় যেন তন্ময় হইয়া বিভোর হইয়া আছেন। রাস্তায় চলিবার সময় তাঁহার একটী বিশেষ ভাব লক্ষ্য করিতাম যে,

তিনি ডানদিকে বা বামদিকে কোন দিকেই মাথা ফিরাইতেন না। রাস্তার দিকে চাহিয়া, স্থির মনে চলিয়া যাইতেন। বেলুড়মঠে প্রসঙ্গক্রমে একদিন প্রশ্ন তুলিলাম "তারকদা, তুমি আগে রাস্তার দিকে তাকাইয়া স্থির হইযা চলিতে? বৌদ্ধ গ্রন্থে আছে যে, ডান পায়ের আঙ্গুল হইতে এক গজ দূরে দৃষ্টি রাখিয়া চলিলে খুব ধ্যান হয়।" তারকদা বলিলেন, "তা অত জানিনা বাপু, আমি স্বভাবতঃই ঐরূপ চলিতাম।" এই সময় তাঁহার মুখের ভাব অতি ধীর, নম্র ছিল, কথাবার্ত্তা অতি মধুর ও যেন জড়াইয়া যাইত। উচ্চ অবস্থা হইতে মনকে দেহের ভিতর আনিয়া শ্রোতা, স্থান বা ক্ষেত্র বা অবস্থা অনুযায়ী কথা কহিতে হইত। এইজন্য, যেন কথাগুলি একটু বিভোর, একটু ঘোর ঘোর মতন হইত এবং চক্ষুর দৃষ্টিও একটু ঘোর ঘোর থাকিত অর্থাৎ গভীর ধ্যান ভগ্ন হইলে মানুষ যেরূপ ভাবে কথা কয়, ঠিক সেই ভাবটা তখন তাঁর ছিল।

কাঁকুড়গাছীর বাগানে—

পরমহংস মশায়ের উপস্থিত কালে রামদা'র কাঁকুড়গাছীর বাগান হয়। তারকদা কিছুদিন নির্জ্জনে থাকিবার মানসে কাঁকুড়গাছীর বাগানে রহিলেন। কি বেয়াড়া মশা মাছি তখন! হাত দিয়ে মশা মাছি ঠেল্‌তে হ'ত, কিন্তু তারকদা এক কম্বল নিয়ে সেখানে পড়েছিলেন। দিনের বেলা কোন

রকম করে কিছু ভাত খেতেন এবং রাত্রে ধুনিতে দু'খানা রুটী পুড়িয়ে নিয়ে সেই পোড়া রুটী ও এক গেলাস জল খেয়ে পড়ে' থাকতেন। বেলুড়মঠে কথাপ্রসঙ্গে একদিন বলিলেন "ওহে! কাঁকুড়গাছীতে যখন পড়ে' থাকতুম, বেশ থাকতুম। বেশ নিরিবিলিতে থাক্তুম। দিনের বেলায় দু'টী ভাত জোগাড় করে খেয়ে নিতুম, আর রাত্রে ধুনিতে দু'খানা রুটী পুড়িয়ে নিয়ে খেতুম আর একমনে সাধন ভজন কর্তুম; তখন ও অঞ্চলে বড় কেউ লোক ছিল না। বাগানে শুধু একটা মালী ছিল; একাটী থেকে সাধন ভজন কর্তুম।"

এইরূপে তারকনাথ আফিসের কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কিছুদিন সিমলা ও কাঁকুড়গাছীতে থাকিয়া কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। শরীর ক্রমে কৃশ হইয়া যাইল কিন্তু দুই চক্ষু হইতে যেন স্নিগ্ধ অগ্নিশিখা নির্গত হইত। গলার আওয়াজ অতি মিষ্ট, কথাগুলি স্নেহপূর্ণ এবং সকলের কাছেই যেন তিনি বিনীত। কি এক অমায়িক মধুর ভাব এই সময় হইতে তাঁহার ভিতর প্রকাশ পাইতে লাগিল!

কালিদাস সরকারের সহিত কথাবার্ত্তা—

কালিদাস সরকার নামে একটী প্রবীণ লোক মধু রায়ের গলিতে থাকিতেন। তিনি আফিসে চাকরী করিতেন এবং ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। পরমহংস

মশায়ের সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব্বে যুবক তারকনাথ সর্ব্বদা ব্রাহ্মসমাজে যাইতেন। তাঁহার গলার স্বর অতি মিষ্ট ছিল। কালিদাস সরকার সন্ধ্যার সময় মাঝে মাঝে বলিতেন, "তারক, একটা ভজন গাও না?" তারকনাথ অতি মধুর কণ্ঠে অনেক সময় এই গানটা গাইতেন:—

"মন চল নিজ নিকেতনে!
সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে ভ্রম কেন অকারণে"
ইত্যাদি—

কাশীপুরের বাগানে—

পরমহংস মশায় বাগবাজার ও সিমলাতে সর্ব্বদা আসা যাওয়া করিতেন। সেই সময় তাঁহাকে অনেক লোকই শ্রদ্ধা ভক্তি করিত। তিনি নিতান্ত ঘরোয়া লোক হওয়ায় সকলেই তাঁহাকে "পরমহংস মশায়" বলিয়া ডাকিতেন। কয়েক বৎসর বাগবাজার ও সিমলায় যাতায়াতের পর তাঁহার শরীর অসুস্থ হইল। তাঁহাকে চিকিৎসার জন্য শ্যামপুকুরের এক বাড়ীতে আনা হইল এবং পরে কাশীপুরে মতিঝিলের সম্মুখে এক বাগান বাড়ীতে তাঁহাকে চিকিৎসার জন্য রাখা হইল। পরমহংস মশায় উপরকার ঘরে থাকিতেন এবং তাঁহার সেবকবৃন্দ নীচেকার 'হল-ঘরে' বাস করিতেন। রামদা, সুরেশ মিত্র প্রভৃতি অপর সকলে দেখাশুনা করিয়া চলিয়া আসিতেন।

রাত্রে ইঁহারা কেহই বাস করিতেন না। যদিও তারকনাথ ও অপর সকলে পরমহংস মশায়ের কাছে দক্ষিণেশ্বরে, বাগবাজারে ও সিমলাতে সর্ব্বদাই যাতায়াত করিতেন কিন্তু সেটা অপেক্ষাকৃত দর্শক হিসাবে। তাঁহাদের প্রকৃত সাধক জীবন কাশীপুর বাগান হইতেই সুরু হয়। এই কাশীপুরের বাগানে কয়েকটী অন্তরঙ্গ যুবকবৃন্দ কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। এই কঠোর তপস্যা পূর্ব্ব অবস্থার তুলনায় অতীব মহান হইয়াছিল। ধুনি জ্বালিয়া বসিয়া জপ ধ্যান, কখনও বা কীর্ত্তন করা, কখনও বা সৎ চর্চ্চা, সৎপ্রসঙ্গ করা, কখনও বা হল-ঘরটীতে বসিয়া জপ করা, ধ্যান করা ইত্যাদি। দিবা রাত্রি তাঁহারা ঈশ্বর-চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন, কঠোর দুরূহ তপস্যা অর্থাৎ প্রাণস্পর্শী তপস্যা এই সময় হইতেই চলিতে লাগিল। ঘটনাবলীতে এই সময়কার বিষয় বলিয়াছি সেইজন্য এইস্থলে বিশেষ করিয়া তাহার উল্লেখ করিলাম না। ফাল্গুন মাসের সকালে একদিন আমি কাশীপুরের বাগানে যাই এবং নিজের চক্ষে তাঁহাদের এই কঠোর তপস্যা অনেকটা দেখিয়াছি।

মহাপুরুষ—

মনে হইতেছে নরেন্দ্রনাথ বুদ্ধগয়া ও গয়াতে এই সময়েই গিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত তারকনাথ ছিলেন এবং অপর আর কে কে ছিলেন আমার জানা নাই। বুদ্ধগয়ার মন্দিরে

পিছন দিকের শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া ধ্যান করিতে করিতে নরেন্দ্রনাথ দেখেন যে, একটা শক্তি তারকনাথের দেহে প্রবেশ করিল। নরেন্দ্রনাথ তদ্দর্শনে তারকনাথের পায়ে প্রণাম করিলেন। তারকনাথ তাহাতে চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, এবং নরেন্দ্রনাথকে মিনতি করিতে লাগিলেন কিন্তু নরেন্দ্রনাথ দৃঢ়ভাবে শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করিলেন। তারকনাথকে সেই হইতে সকলে 'মহাপুরুষ' বলিয়া ডাকিতেন। নরেন্দ্রনাথের প্রণামের কারণ হইতেছে, দেহকে নয় কিন্তু শক্তিকে। শক্তি যে আধারে থাকিবেন সেই আধারকেও প্রণাম করিতে হয় ও সম্মান করিতে হয়, এইজন্য আধারকে উপলক্ষ্য করিয়া শক্তিকেই প্রণাম করা হয়। আমার যতদূর স্মরণ আছে এটা কাশীপুরের বাগানে অবস্থানকালে হইয়াছিল কিন্তু সঠিক এখন স্মরণ হইতেছে না।

বরাহনগর মঠ প্রতিষ্ঠা—

এইরূপে কাশীপুর বাগানে তাঁহাদের কঠোর তপস্যা করিবার কালে পরমহংস মহাশয় দেহ রক্ষা করেন। সেই সময় নানা গণ্ডগোল উপস্থিত হইল অর্থাৎ সকলেই বাড়ী ফিরিয়া যাইবে কিনা এই প্রশ্ন উঠিল। রামদা, সুরেশ মিত্র, গিরীশ ঘোষ ইঁহারাই তখন প্রবীণ। ইঁহারা তখন স্থির করিলেন যে, যে যার বাড়ী ফিরিয়া যাউক ও নিজ নিজ কার্য্য করিতে থাকুক

কিন্তু নরেন্দ্রনাথ মনে মনে স্থির করিলেন যে, আর বাড়ী ফিরিয়া যাইবেন না। সকলে মিলিয়া কঠোর তপস্যা করিবেন। প্রবীণেরা একদল হইলেন, যুবকেরা একদল হইল। অবশেষে সুরেশ মিত্র বলিলেন বুড়োগোপাল, তারক, ও লাটু এই তিনজনের থাকিবার জন্য একটা স্থান করে দেওয়া আবশ্যক এবং তিনি তাহার ভার লইবেন। এইরূপ নানা গণ্ডগোলের পর, বরানগরে মুন্সীদের একটা পোড়ো বাড়ী ভাড়া করা হইল এবং পরমহংস মশায়ের ব্যবহৃত শয্যা প্রভৃতি সেই স্থানে লইয়া যাওয়া হইল। এইরূপে বরানগরের মঠ প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইল। এই সময়কার কথা বিশদ-ভাবে বলিবার আবশ্যক নাই বিবেচনায় তাহা পরিত্যক্ত হইল।

মঠের সন্ধানে—

এই গ্রন্থে আমি তারকনাথের জীবনী লিখিতেছি সেইজন্য অপর অংশসকল অধিক পরিমাণে পরিত্যাগ করিলাম, কেবলমাত্র তারকনাথের বিষয়ই বর্ণনা করিব। বরানগরের মঠ স্থাপনের কয়েক দিবস পর, সকালে খুঁজিতে খুঁজিতে পরামাণিকের ঘাটের গলিতে যাইলাম। বাড়ী চিনি না, এবং কোনদিকে যেতে হবে তাও জানি না। মুন্সীদের পোড়ো বাড়ীর সদর দিকটায়, অর্থাৎ যেখানটা ফটকটা ছিল, সেখানে ফুলের গাছ ছিল; দেখি না, যুবক শশী মাথা নেড়া করেছেন; একখানি কাপড় খানিকটা গায়ে দেওয়া; ফুলের সাজি হাতে করে ফুল তুল্‌ছেন। আমি

দেখেত' হাঁপ ছেড়ে' বাঁচলুম ; যা'হোক, একটী ঠিকানা পাওয়া গেল ! শশী মহারাজ বল্লেন, "কিরে ! তুই কি ক'রে এলি ? আমি বল্লুম, "অনেক খুঁজে খুঁজে এসেছি" শশী মহারাজ বল্লেন, "পাশের দরজাটা দিয়ে ভিতরে যা ! একটা উঠান পাবি, উঠানের পশ্চিম দিকে সিঁড়ি আছে, সিঁড়ি দিয়ে উঠে ওপরে যাবি, তারপর একেবারে বাঁ'দিকের ভিতরের দরজা দিয়ে উত্তর-দিকে গেলে দেখবি সকলে আছে। আমি ফুল তুলে পরে যাচ্ছি. তুই আগে যা !" আমি তদ্রূপই করিলাম। গিয়ে দেখি. তারকদা, রাখাল মহারাজ, নিরঞ্জন মহারাজ প্রভৃতি অনেকেই রয়েছেন। এইত' খুব আহ্লাদ হ'ল। তারপর কথাবার্ত্তা কয়ে ফিরে এলাম।

মঠে বৈরাগ্যের ভাব—

এই সময়ে সকলের ভিতর তীব্র বৈরাগ্যের ভাব উঠিল, কারও কাছে কোন জিনিষ চাইবেন না। নিজেরা মাধুকরী করিয়া বা মুষ্টিভিক্ষা করিয়া চাল আনিয়া খাইবেন এবং এক মন ও এক প্রাণে তপস্যা করিবেন। কাহারও প্রদত্ত কোন বস্তু গ্রহণ করিবেন না।

মঠ-বাড়ীর বর্ণনা—

পরামাণিকের ঘাটের রাস্তায় মুন্সীদের একটা পুরাণ বাড়ী ছিল। তা'র পশ্চিম দিকের অংশটা মঠের জন্য ভাড়া করা হইল।

সুমুখে একটা উঠান, একতলাটা শিয়ালেতে, ইঁদুরেতে মাটী তুলে প্রায় ভরাট করে এনেছিল। অনেক জায়গায় প্রায় এক কোমরের বেশী মাটী উঁচু হয়েছিল। একতলাটা আর ব্যবহার করবার মতন উপায় ছিল না। পশ্চিম দিকে একটা ভাঙ্গা ভাঙ্গা বড় সিঁড়ি ছিল, সেটা ঘুরে দোতলার বারাণ্ডায় গিয়ে পড়্‌ত। এই সিঁড়ি থেকে উঠে দক্ষিণ দিকে একটা ঘরেতে বরানগরের কয়েকটী যুবক "আত্মোন্নতি বিধায়িনী" ব'লে একটী পুস্তকাগার করে'ছিল। সিঁড়ির বাঁদিকে অর্থাৎ উত্তর দিকে একটা ঘর, তাইতে কাপড়ের বেড়া দিয়ে ছু'তিন টুকরা খাটাল হয়েছিল। প্রথমে রাখাল মহারাজ এক খাটালের ভিতর জপ ধ্যান কর্‌তেন; যোগেন মহারাজ আর এক খাটালে থেকে জপ ধ্যান কর্‌তেন; এবং কালী বেদান্তী আর এক খাটালে জপ ধ্যান কর্‌তেন। বাইরের দিকে বড় দালানটায় অর্থাৎ এই ঘর কয়েকটীর সামনে যে দালান, তাইতে ভাঙ্গা ভাঙ্গা কাঠের গরাদে ছিল এবং মেঝেতে অনেক জায়গায় খোয়া উঠে গিয়াছিল। মেঝেতে কোন কোন জায়গায় ছুই তিন ইঞ্চি ধূলা জমে থাক্‌ত। ছাদের অনেক জায়গায় বরগা পড়ে গিয়াছিল, বাঁশ চিরে গুঁজে দিয়ে ছাদের ইটগুলো রক্ষা করা হ'ত। এই ঘরটীর পর আর একটী ঘর, যেটার ভিতরদিক দিয়েও দরজা ছিল ও বাইরের দিক দিয়েও দরজা ছিল। এই ঘরটী ঠাকুরঘর হইল। তারপর ছুটা ধাপ সিঁড়ি দিয়ে উঠে একটা দরজা, দরজার পর ভিতর

দিক। ভিতরদিকে প্রথম একটা লম্বা ঘর, তারপরে আর একটা ছোট ঘর, তারপরে পায়খানা যাবার একটা পথ আর দালানটার উত্তর দিকে অর্থাৎ শেষপ্রান্তে রান্নাঘর ও ভাঁড়ার ঘর। পায়খানা যাবার পথে নীচে যাইবার একটা সিঁড়ি ছিল। সেই সিঁড়ি ধ'রে নেমে একটা অন্ধকার ঘর দিয়ে গেলে বাইরে একটা উঠান বা পোড়ো বাগানে পড়া যেত। বাগানের উত্তরদিকে অনতিদূরে একটা পুকুর ছিল, ভিতরদিকে ঢোকবার যে দরজাটা অর্থাৎ ভিতরকার দালানে প্রবেশ করিলে বাঁম-দিকের একটা দরজা দিয়া ঠাকুরঘরে যাওয়া যেত। ঘরের আর একটী দরজা যে বাহিরের দালানের দিকেও ছিল, সে সকল কথা পূর্ব্বে বলা হয়েছে। এই দ্বিতীয় উক্ত দরজাটী প্রায় বন্ধ থাকিত। কখন কখনও খোলা হইত। ভিতরকার দালানটাতে পূর্ব্বদিকে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ঝিলমিলিওয়ালা জানালা ছিল; জানালার অনেক জায়গায় মোটেই ঝিল্‌মিলি ছিল না; এইটাকেই ভিতরকার দালান বলা হইত। এই দালানের পশ্চিম দিকে একটা বড় ঘর ছিল, লোহার গরাদে দেওয়া বড় বড় জানালা, জানালার অনেক জায়গাকার তক্তা পড়ে গিছ্‌ল। এই বড় ঘরেতে খানকতক বালান্দার মাদুর পাতা ছিল। হোগ-লার মত মোটা একরকম চ্যাটায়ের মাদুর, তা'র উপর সুতা গোণা যায় এমন একখানা সতরঞ্চী ছিল। সেখানাকে জেলে-দের জাল বিশেষ বলা যায়। বড় ঘরের দক্ষিণ দিকে দেওয়ালেতে

একটা কাঠের তাক ছিল। তা'র উপর খান কতক বই থাক্‌ত। এই হ'ল বড় ঘরের বর্ণনা।

ঠাকুর পূজা—

প্রথম যখন মঠ করা হয় অনেকেই ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি বলিলেন "দেখ, আমরা সন্ন্যাসী, কখন্ কোথায় থাকি ঠিক নাই। ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করিলে মহা হাঙ্গাম হইবে, অতএব ঠাকুর পূজা করে' কোন আবশ্যক নাই, কিন্তু শশী মহারাজ জেদ করাতে ঠাকুর ঘর প্রতিষ্ঠিত হইল। সুরেশ মিত্র ঠাকুরঘর করিতে নারাজ ছিলেন। যাহা হউক, শশীমহারাজের আগ্রহতেই ঠাকুরঘর হয়েছিল এবং তিনি এক মন, এক প্রাণ দিয়ে ঠাকুরের সেবায় ছিলেন। আলমবাজারের বাগান সকল থেকে এবং এখান ওখান থেকে ঘুরে নিজেই ফুল আনিতেন এবং নিজেই পূজা করিতেন। তাহার মন্ত্র একই কথা ছিল "জয় গুরুদেব শ্রীগুরুদেব! জয় গুরুদেব শ্রীগুরুদেব! জয় গুরুদেব শ্রীগুরুদেব!" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে তিনি একেবারে বিভোর হ'য়ে উঠ্‌তেন, গলার আওয়াজে যেন সিংহ বিক্রমে হইত। সন্ধ্যার সময় ঠাকুরঘরের আরতি করে তিনি বড় ঘরটীতে আস্‌তেন। বড় ঘরের দেওয়ালেতে অনেক-গুলি খৃষ্টীয় সাধুসন্তের ছবি ছিল এবং একখানা শ্রীশ্রীকালী-মাতার বড় ছবিও ছিল, সেটা বেলুড়মঠে গঙ্গার ধারে পীচ

দেওয়া ঘরে ছিল। শশী মহারাজ ধূনার পাত্রটী হাতে নিয়ে একবার করে সেই ছবি গুলিকে প্রণাম করিতেন এবং গম্ভীর নাদে তাঁ'র প্রিয় মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন।

আহারাদি—

প্রথম কয়েক মাস কাহারও কাছ থেকে কোন দ্রব্যাদি লওয়া হইত না। সকলে মুষ্টিভিক্ষা ক'রে কিছু চাল আন্‌ত। তাহা একটা হাণ্ডাতে সিদ্ধ করা হ'ত, আর নুন লঙ্কা আর একটা হাঁড়ীতে সিদ্ধ করা হ'ত। কখন কখন তা'তে তেলাকুচার পাতাও কুচিয়ে দেওয়া হ'ত। এই হ'ল ভাত আর এই হ'ল তরকারী। তারপর সেই ভাত গুলো একটা কাপড়ে ঢেলে সকলে চারিদিকে ঘিরে বস্‌ত এবং সেই লঙ্কাজলের একটা বাটী ভাতের গাদার উপরে থাক্‌ত। একবার ক'রে ভাত মুখে দিত, আর একবার লঙ্কার জল মুখে দিত। জিভটা জ্বলে উঠ্‌লে ভাতটা নেবে যে'ত। আর জল খাবার জন্য একটা মাত্র পিতলের হিন্দুস্থানী ঘটী ছিল, তাইতে সকলেই জল খে'ত। সেই ঘটীটা বলুড় মঠে পর্য্যন্ত ছিল, পরে ফুটো হ'য়ে যাওয়ায় মঠের ভাঁড়ারে তা'কে রেখে' দেওয়া হ'য়েছিল। এখন তা'র বিষয় জানা নেই। আমিও দু'একবার এই লঙ্কার জল আর ভাত খ'য়েছিলুম। কি ভয়ঙ্কর ঝাল! এখনও তা' মনে আছে। এই ভাত খাবার সময় সকলের কি আনন্দ! একবার করে'

ভাত খাচ্চে আর উচ্চৈঃস্বরে আনন্দে চীৎকার কর্‌ছে এবং উচ্চ বিষয়ের নানা কথা চল্‌ছে। এই ভাত খাওয়া তত কষ্টের জিনিস ছিল না। ইহা একটা আনন্দের মিলন ছিল, কত হাসি কত তামাসা হ'ত। কত ত্যাগ বৈরাগ্যের কথা হ'ত। রাত্রে খানকতক রুটী হ'ত। রাত্রে বড় ভাত হ'ত না। রাত্রে সকলেই রুটী খেতেন। এই সময় ঠাকুরের দিনের বেলায় কি ভোগ দেওয়া হ'ত আমার স্মরণ নাই, তবে রাত্রে খানকতক রুটী, একটু তরকারী আর একটু সুজির পায়েস দেওয়া হ'ত। তখন ঠাকুরের লুচির কোন বন্দোবস্ত ছিল না।

রাত্রে শয়ন—

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বড় ঘরটাতে বালাণ্ডা বা পট্ পটে চ্যাটাই পাতা ছিল। তা'র উপর একখানা সুতা বারকরা ছেঁড়া সতরঞ্চি। ছোট ঘরটাতেও, যোগেন মহারাজ যেখানে থাকতেন অর্থাৎ ঘরে ঢুকে ডান দিকে, সেখানেও ঐ রকম একটা বালাণ্ডার চ্যাটাই ছিল। রাত্রে গায়ের লেপ কম্বল কিছুই ছিল না। প্রথম যে যার শিয়রে চ্যাটাইয়ের নীচে একখানা করে ইঁট দিয়ে মাথা উঁচু করে রাখ্‌তো, এই হ'ল বালিশ, আর এই হ'ল বিছানা, তবে মশার বড় উৎপাত ছিল, এই জন্য একটা বড় মশারী ছিল। আমি একদিন রাত্রে রইলুম, দেখলুম বড় মশারীতে বেশী লোক শুলো এবং আলাদা একটা ছোট

মশারীতে বাবুরাম মহারাজ শুলো। শীতকালে রাত্রে ঠাণ্ডা লাগলে, পরস্পর ঘেঁসাঘেঁসি করে শুতো, তাতেও শীত না ভাঙ্গলে খানিকক্ষণ কুস্তি লড়ে নিত, তাতে শরীরটা একটু গরম হ'লে বাকি রাত্রিটা কোঁচার কাপড় গায়ে দিয়ে কেটে যে'ত। এটা বলছি প্রথম অবস্থার কথা। শীতকালে সব কোঁচাটা গায়ে জড়িয়ে থাকত, এইজন্য বলরাম বাবু খানচারেক সাদা লুই ধোসা দিয়েছিলেন। কিছুদিন পর ছোট ছোট লাল খেরোর বালিশও হয়েছিল, তা'তে মাথা দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে শুতে পারত, তবে লেপ কম্বল তখনও হয় নাই। তারপর খানকতক কম্বল হ'ল।

পড়াশুনা—

এই সময়ে ত্যাগী ভক্তদের ভিতর কয়েকটী ভাব বা ভাগ হইল। নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি কয়েকজন পড়াশুনার দিকে খুব মন দিলেন। হিন্দুর সমস্ত গ্রন্থ, খৃষ্টীয় গ্রন্থ এবং বৌদ্ধ গ্রন্থের বিশেষ আলোচনা হইল। বৌদ্ধ গ্রন্থের ভিতর প্রজ্ঞা পারমিতা, ললিত বিস্তার প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ পাঠ হইল। এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে দুস্প্রাপ্য গ্রন্থ সকল আনাইয়া নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সকলে পড়িতে লাগিলেন। কালী বেদান্তীও এই সংখ্যার ভিতর। পড়া শুনা যখন চলিল তখন রীতিমত ভাবে গ্রন্থ পাঠ ও তদ্বিষয়ে আলোচনা হইতে লাগিল। ঠিক যেন পরীক্ষা

দিতে যাইবে এইভাবে পড়াশুনা চলিতে লাগিল। আর এক ভাগ হইল, তাহাদের মত হইল যে সাধন ভজন তপস্যাই হইল প্রধান বস্তু। পড়াশুনার আর আবশ্যক নাই। কঠোর তপস্যা, জপ ধ্যান ইত্যাদি হইল প্রধান জিনিষ। শরৎ মহারাজ একদিন হাসিতে হাসিতে আমাকে বলিলেন, "আরে বাপু! স্কুল ছাড়লুম, হলুম সাধু, এখানেও পড়াশুনা করা? যেন বি, এ, পরীক্ষা (Examine) দিতে যাব। তোমার দাদার হ্যাপায় পড়ে প্রাণটা ওষ্ঠাগত হ'য়ে উঠেছিল।" এটা হইল ব্যঙ্গচ্ছলের কথা। শরৎ মহারাজ পড়াশুনার দিকের লোক। খুব অতিরিক্ত না হ'লেও, তিনি পড়াশুনার পক্ষপাতী ছিলেন। শশী মহারাজ বি, এ, পরীক্ষা দিবার কিছু আগেই বাড়ী ছাড়িয়াছিলেন। তিনি গণিত বিদ্যা ভাল বাসিতেন, এইজন্য একটু অবসর পাইলেই একখানা গণিতের পুস্তক, Algebra হোক বা যা কিছু হো'ক লইয়া শ্লেটে অঙ্ক কষিতেন। এটা তাঁ'র শ্রম লাঘবের একটা উপায় ছিল। একদিন সকালে হাঁসতে হাঁসতে আমায় বল্লেন, "ওহে! দেখ সংস্কার কি প্রবল জিনিষ। এত বছর বাড়ী ছেড়ে এসেছি, সাধু হয়েছি, কল্‌কাতা আর কখনও যাই না—কিন্তু কাল রাত্তিরে স্বপ্ন দেখেছি যেন এক্‌জামিন দিতে যাব। তাই তাড়াতাড়ি করে' বইগুলো পড়ে' নিচ্চি। পূর্ব্ব সংস্কার এখনও রয়েছে, এটা যাবার নয়।" এই বলে তিনি হাঁসতে লাগলেন। শশী মহারাজ অবসর

পাইলেই শ্রীমদ্ভাগবতের ঋষভদেবের উপাখ্যানটী পড়িতেন এবং আরও বলিতেন, "দেখ, এই ঋষভদেবের হচ্চে ঠিক ঠিক পরমহংস অবস্থা।" শশী মহারাজ Mark Twain এর (মার্ক-টোয়েন) "Innocent at Home" ও "Innocent Abroad" বই দু'খানা ভারি পড়িতেন। যাহো'ক শশী মহারাজ পড়াশুনা দিকেরই লোক। কিন্তু যোগেন মহারাজ, নিরঞ্জন মহারাজ ও তারকদা এঁরা এত পড়াশুনার দিকের লোক ন'ন। ইঁহারা সাধন-মার্গের লোক। সাধন, ভজন, জপ ও ধ্যান ইঁহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। ইঁহারা পড়াশুনাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর বস্তু বলিতেন। আর কয়েকটী হইল ভক্তির লোক। তাঁরা ভক্তি করিবেন এবং ভক্তিমার্গের সাধন-ভজন করিবেন ইত্যাদি। তখনকার দিনে, প্রচলিত কথায়, দুই শ্রেণীর বিভাগ হইল। এক 'দানার' দল—তাঁ'রা বাহ্যিক কিছু বিধি-নিয়ম মানিতে চান না। কঠোর বৈরাগ্য ভাবের লোক, যেন নূতন শক্তি বার ক'রে জগতকে প্লাবিত করিবেন। প্রথম হইতেই তাঁহারা সেই বিষয়ের সূচনা করিতে ছিলেন এবং নিজেদের ভিতর শক্তি সঞ্চয় করিয়া জগতের উপর কি ক'রে সেই শক্তি বিকীরণ করিতে হয়, তাহারই উপায় উদ্ভাবন করিতেছিলেন অর্থাৎ 'জগৎ' বড় কি 'অহং' বড় এই বিষয়ের 'উত্তরপক্ষ' ও 'পূর্ব্বপক্ষ' পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। এই 'দানার' দলই পরে জনসমাজে বিশেষ পরিচিত হইয়াছিলেন। অপর শ্রেণী—'সখীর দল' অর্থাৎ যাঁহারা

ভক্তিভাবে সাধন করেন। অনেকটা মৃদু ভাবাপন্ন লোক। এই সখীভাবের ভিতর দেবেন বাবু, মাষ্টার মহাশয়, বাবুরাম মহারাজ ইত্যাদি অনেকে পড়েন।

সুরেশ মিত্র 'দানার' দল। বলরাম বাবু 'সখীর' দল। এই জন্য সুরেশ মিত্র ও বলরাম বাবুতে দেখা হইলেই ব্যঙ্গচ্ছলে খুব হাসি তামাসা হইত। দু'জনেই এক বয়সী ও খুব ভাব। সুরেশ মিত্র বলিতেন, "বলরাম, তোদের রাধা-কৃষ্ণ একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে পীঁ পীঁ করে বাঁশী বাজায়, আর পা বেঁকিয়ে নাচে। আর আমার মা কালী কি জানিস্? হাতে খাঁড়া, জিভ্ বার করা; লাক্ চড়াচড়্ লাক্ চড়াচড়্ ঢাক বাজ্ছে। ঢাকের আওয়াজে তোর পীঁ পীঁ বন্ধ হ'য়ে যা'বে।" এইরূপে খুব দুজনে হাসি তামাসা করিতেন এবং পক্ষান্তরে ভক্তির ভাবটা খুব বাড়িয়া যাইত। ভক্তির নিয়ম হইতেছে, ঝগড়া না করিলে ভক্তির আধিক্য ও উৎকর্ষ হয় না। সেই জন্য দুই বন্ধু এক সঙ্গে দেখা হইলেই খানিকটা ঝগড়া ক'রে ভক্তিটা গাঢ় করিয়া লইতেন। 'দানার' দল ও 'সখীর' দল এটা হইতেছে আপোষে একটু ঝগড়া করিবার জন্য। পরস্পরে বসিয়া শুধু মিষ্ট কথা বল্লে ভালবাসাটা তত বাড়ে না, এই জন্য গায়ে প'ড়ে খুনশুড়ি ক'রে ঝগড়া করিত, আর খুব হাসি তামাসা হইত। এতে ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও ভক্তি আরও বাড়িয়া যাইত। এস্থলে একথা বুঝিতে হইবে যে নরেন্দ্রনাথ

প্রভৃতি যাঁহারা পড়াশুনার পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁহারাও খুব সাধন-ভজন করিতেন। সাধন-ভজন যেন প্রাণের জিনিষ ছিল, প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ; পড়াশুনাটা আনুসঙ্গিক বস্তু। মোটকথা বরানগর মঠ একটী সর্ব্বতোমুখ ভাবের কেন্দ্রীয় স্থান ছিল।

এক সময়ে জপ, ধ্যান ও তপস্যা খুব চলিল। সকলেই তন্ময় হইয়া জপ, ধ্যান করিতে লাগিল। ইহাতে অনেকটা শুষ্কভাব আসে ; এই শুষ্কভাবটা পরিহার করিবার জন্য সেবা ভাবটার খুব চর্চ্চা চলিল। তখন এমন ভাব উঠিল যে, সেবা করাই যেন প্রধান পন্থা। আবার কিছুদিন ভক্তির প্রাধান্য জাগিয়া উঠিল। তখন এমনই হইল যে ভক্তিই একমাত্র উপায়। এই কথাগুলি উল্লেখ করিবার উদ্দেশ্য হইতেছে যে, একঘেঁয়ে গোঁড়ামীর ভাব কিছু ছিল না, সবরকম ভাবই পর্য্যায়ক্রমে আলোচিত হইত। সেই 'আউল,' 'বাউল' ও 'কর্ত্তাভজা'দের গান থেকে বেদান্তের 'অদ্বৈতবাদ'—সব রকম জিনিষ পর্য্যায়ক্রমে আলোচিত হইত। কোনটা ত্যাজ্য বা গ্রাহ্য বলিয়া পরিগণিত হইত না। তবে নরেন্দ্রনাথের এক বিশেষ শক্তি ছিল। যখন যে ভাব বা যে মার্গের উপর কথা কহিতেন, সেই কয়েক দিন সকলের ভিতর এমন ধারণা করিয়া দিতেন যে, সেইটাই একমাত্র পথ বলিয়া বোধ হইত ; যেন সেইটাই অবলম্বন করিলে ঈশ্বর লাভ হইবে। সেজন্য সকলেই উৎসাহিত হইয়া সেই মার্গের সাধন-ভজন করিতেন ; কিন্তু পাছে একঘেঁয়েমী হয় ও নিতান্ত গণ্ডীর ভিতর

থাকে, এই জন্য কিছুদিন পরে অপর একটী ভাবের প্রাধান্য দেখাইতেন। তিনি সকলকে সব রকম ভাবের ভিতর দিয়া লইয়া যাইতেন।

তারকদা'র ভিতর প্রথম হইতেই একটা ভাব খুব স্পষ্ট লক্ষিত হইত। একদিকে যেমন তিনি নির্লিপ্ত ত্যাগী পুরুষ ছিলেন, কোন বস্তুতে যেমন তাঁর আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছা ছিল না, অপরদিকে তাঁ'র অতিশয় উদার ভাব ছিল অর্থাৎ কোন গণ্ডী বা সীমার ভিতর তিনি থাকিতে পারিতেন না। এই সময় তাঁর মুখে প্রায় এই কথাটা থাকিত—"অখণ্ড সচ্চিদানন্দ"। এত বিধি, নিয়ম, পূজা—এ সব তাঁ'র ভাল লাগিত না। তাঁ'র ধাতস্থ এ সব নয়। "অখণ্ড সচ্চিদানন্দ" ভাবটাই তাঁ'র খুব প্রবল ছিল। অপর যা' কিছু তিনি করিতেন বটে, কিন্তু সেটা তাঁ'র প্রাণের জিনিষ নয়! তাঁ'র ভবিষ্যত জীবনে এবং জীবনের শেষ অবস্থায় এই ভাবটা আরও প্রবল ভাবেই প্রকাশ পাইয়াছিল,—যদিও তিনি কোন বিশেষ ভাবের বিরোধী বা পক্ষপাতী ছিলেন না। এই "অখণ্ড সচ্চিদানন্দ" ভাবটী ভবিষ্যতে তাঁ'র ভিতর ভালবাসা উদ্ভূত করিয়াছিল। এই ভালবাসা হইতেছে আত্মপ্রসারণ (Self-expansion) অর্থাৎ নিজের আত্মাকে সর্ব্ব বস্তুর ভিতর দর্শন করা। যাহা হউক, এই সময়ে মঠেতে অল্প বিস্তর দুই প্রকার ভাব হইয়াছিল—একপক্ষ পড়াশুনা ও সাধন-ভজন, অপর পক্ষ কেবলমাত্র সাধন-ভজন। ইহা কোন দোষণীয় ব্যাপার নহে। যে

যাঁর নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন।

শশী মহারাজের গুরুসেবার কথা—

শশী মহারাজ স্কুলে পড়িবার সময় যখন গৌরমোহন মুখুজ্জের গলিতে আমাদের বাড়ীতে আসিতেন, তখন তাঁর বয়স অতি অল্প। দেখিতে ফর্‌সা ও কৃশ কিন্তু মুখে একটু কোঁক্‌ড়া কোঁকড়া দাড়ী ছিল। বরানগর মঠেতে তিনি দাড়ী চুল, গোঁফ কামাইলেন। শরীর দেখিতে আরও কৃশ হইল। ছিপ্‌ছিপে পাত্‌লা একটী ছোকরা। একদিন দুপুর বেলা বড় দালানটীতে শশী মহারাজ এসে বস্‌লেন। তারকদা আগে থেকেই বসে ছিলেন। আমি তারকদা'র সুমুখে বসেছিলুম এবং রজনী গুপ্ত নামেও একটী লোক বসে' ছিল। কথা উঠ্‌ল যে সাধন ভজন করাই প্রধান জিনিষ। তারকদা বলিলেন যে, সাধন ভজন করিতে হইলে এক জায়গায় থাকা চলে না। ভিন্ন স্থান ও তীর্থাদি দর্শন করা আবশ্যক ; কারণ এই সকল হইতেছে সাধনের সহায়ক। তিনি বলিলেন, 'কি বল শশী ?" শশী মহারাজ বলিলেন, "আমি কিন্তু ও সব ভাল বুঝিনি। গুরু মহারাজের সেবা করা, এই হ'ল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু। আমি কোন তীর্থাদিতে যাইতে ইচ্ছা করি না। আমি সমস্ত জীবন এই গুরু মহারাজের সেবাতেই দিব।" তারকদা

বলিলেন—"না হে শশী, না ! অল্পদিন পরেই ক্লান্ত হ'য়ে পড়বে ; তখন আর কিছুতেই ভাল লাগবে না।" শশীমহারাজ জিদ্ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি সমস্ত জীবনই গুরু মহারাজের সেবায় লাগা'ব, এই হ'ল আমার সাধন ভজন।" এইরূপ ভাবে খানিকক্ষণ কথাবার্ত্তা চলিল।

পায়খানা ধোয়া—

বরানগর মঠে উত্তর দিকের অংশে দোতলাতে একটা ছোট গলি, তা'র পরে একটা পায়খানা ছিল ; সেই পায়খানা ঘরটীতে জানালা ছিল না। কয়েকটা ঘুল ঘুলি দিয়ে আলো আস্ত। একটা ফোকর ছিল এবং ফোকরের দুই পাশে পা রাখবার জন্য নয় ইঞ্চি চওড়া, দু ফুট লম্বা, এক ইঞ্চি পুরু দু'খানা টালি ছিল ; সেই টালির উপর দিয়ে ফোকরে বস্তে হ'ত। আর পায়খানা যাবার গলিতে গোটা দুই মাটীর গামলাতে জল থাক্ত। একদিন কথা প্রসঙ্গে নরেন্দ্রনাথ বলিলেন "গুরু মহারাজ অপরের পায়খানা নিজে সাফ্ করিয়াছিলেন ; ইহা হইতেছে আত্ম অভিমান ত্যাগ করিবার একটা উপায়। দ্বিতীয়তঃ ইহার দ্বারা পরস্পরকে বিশেষ ভাবে সেবা করা যায়।" কথাগুলি তিনি ওজস্বিতার সহিত বলিয়াছিলেন। সকলের প্রাণে এমনি লাগিল যে, তার পরের দিন হইতে অন্য এক পন্থা সকলে ধরিলেন, শেষরাত্রে কেউ উঠিয়া মাঠের পুকুর থেকে জল এনে, মাটীর গামলা দুটা ভরে রাখ্তেন ; পায়খানাটী বেশ

করে ধুয়ে পরিষ্কার করে, হুঁকায় জল ফিরিয়ে, গোটাকতক কল্‌কেতে বেশ করে তামাক সেজে, সব ঠিক করে রেখে নিজের জায়গায় শুয়ে' থাকতেন। সকাল বেলা অপরে পায়খানায় গিয়ে দেখে যে, সব পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। তারপর একজন পায়খানায় বস্‌ল, আর বাকি সকলে পায়খানার সুমুখে গলিটাতে উপু হ'য়ে বসল। সকলেই উদম নেঙ্গটো। এক একবার তামাক টান্‌ছে, আর নানা উচ্চ বিষয়ে কথা চলিতেছে। আবার যার যখন পায়খানার বেগ আস্‌ত সে ফোকরে গিয়ে বস্‌ত। আর অপর ব্যক্তি নেমে তামাক টান্‌ত। এইরূপে সেই পায়খানাতেই এক মজলিস বসে' গেল এবং নানা উচ্চ বিষয়ের কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। এমন কি যা'রা বিশেষ আপনা আপনি লোক, সকাল বেলা আসিবে, তারাও সেই পায়খানা মজলিশেই গিয়ে বস্‌ত, আর হুঁকোটা টেনে নিয়ে তামাক টান্‌তো, আর কথাবার্ত্তাতেও মেতে যেতো। এইরূপে সেই পায়খানা ঘরটী উচ্চ অঙ্গের কথাবার্ত্তার স্থান হইয়া উঠিল। সকলেই উলঙ্গ আর সকলেই কথাবার্ত্তাতে মেতে গেছে, কিন্তু কে কোন্ দিন উঠিয়া পায়খানা সাফ্ করিত তাহা কেউ টের পাইত না। যাহা হউক, পরস্পরকে সেবা করা, পরস্পরের প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা দেখান ও একপ্রাণে সাধন ভজন করার —ইহা একটী জ্বলন্ত উদাহরণ। এই সম্বন্ধে চিন্তা করিবার অনেক কিছু আছে।

পুকুর থেকে জল তুলে আনা—

একদিন বেলা সাড়ে নয়টা দশটার সময় তারকদা বলিলেন, "মহিন, মুখ ধোবার'ত জল নেই, এখন তুমি একটা বালতী নাও আমিও একটা বালতি নি', চল দুজনে গিয়ে মাঠের পুকুর থেকে জল আনি।" দুজনে দুটো বালতি নিয়ে পায়খানায় যাবার পথের নিকট সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে, একটা অন্ধকার ঘরের ভিতর দিক দিয়ে গিয়ে বাইরের পোড়ো বাগানটাতে গিয়ে পড়্‌লুম। তারপর খানিকটা গিয়ে উত্তর দিকে একটা পুকুরের ঘাট পেল্‌ুম। তারকদা'রও শুধু পা, আমারও শুধু পা। পুকুরধারেতে অনেক গেঁড়ী ছিল। আমরা জল নিয়ে আসবার সময়, অন্যমনস্ক হওয়ায়, তারকদা'র পা কতকগুলি গেঁড়ীর উপর প'ড়লো। গেঁড়ীগুলি ভেঙ্গে গিয়ে পায়ে বিঁধে গেল এবং পা দিয়ে ঝর্ ঝর্ ক'রে রক্ত প'ড়তে লাগল। আমিত দেখে শিউরে উঠ্‌লুম এবং ভয় পেয়ে বল্‌লুম "তারকদা' কি হ'ল? রক্ত প'ড়ছে যে? আমি বড় চঞ্চল হ'য়ে পড়েছিলুম, কিন্তু তারকদা তাঁর স্বাভাবিক হাঁসি মুখেতে' অতি স্থির স্নেহপূর্ণ স্বরেতে বল্‌লেন, "তা কি হ'বে? একটু রক্ত প'ড়েছে তা'তে আর ক্ষতি কি? শরীরের দিকে অত চাইলে কি কাজ হয়? ও সব দেখ্‌তে নেই, চল জল নিয়ে যাই।" এই ব'লে দুজনে জলের বালতি নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে এসে, বড় দালানে যেখানে জলের বালতি থাক্‌ত—সেইখানে বালতি দুটা রাখলুম। তারকদা

বেশ হাঁসিমুখে বেড়াতে লাগলেন, কিন্তু আমার মনটা বড় কর্ কর্ করতে লাগল।

একটু অবস্থার পরিবর্ত্তন

প্রথমে কয়েক মাস তীব্র বৈরাগ্য বশতঃ সকলে অতিশয় কঠোর ব্রত অবলম্বন করেছিলেন, কিন্তু ভদ্রলোকের ছেলে অধিকাংশই তখন সবে কলেজ থেকে বেরিয়ে এসেছেন, তাহাদের পক্ষে ইহা অতিশয় দুঃসহ হ'য়ে উঠ্ল। লোকের বাড়ী থেকে মুষ্টিভিক্ষা করা, আর সেই চাল সিদ্ধ ক'রে কাপড়ে ঢেলে লঙ্কা সিদ্ধর জল তরকারী দিয়ে খাওয়া, ইহা অতীব কষ্টকর হইয়া উঠিল, কিন্তু কেহই অপরের প্রদত্ত সাহায্য লইতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তারকনাথও অনেকবার নিজে মুষ্টিভিক্ষা করিয়া আনিতেন। প্রথম থেকেই তারকনাথের একটী বিশেষ ভাব দেখা যাইত যে, তাঁহার ভিতর দ্বিধা, সঙ্কোচ, উচ্চ, নীচ, সঙ্কীর্ণ ভাব এ সব কিছুই ছিল না। তিনি নিতান্ত সরল প্রাণ বালকের ন্যায়, নিঃসঙ্কোচে, অতি নম্র, মিষ্ট ও মধুর ভাবে সমস্ত কার্য্য করিতেন। লজ্জা বা হীনতা—এ ভাব তাঁহার ভিতর ছিল না। প্রত্যেক ছোট কাজের ভিতরেও তিনি একটা উচ্চ ভাব দেখিতে পাইতেন। এইজন্য তিনি কোন সঙ্কোচ না করিয়া অতি সামান্য কাজও করিতে যাইতেন। এই সময়ে ঠাকুরের সেবার জন্য বলরাম বাবু কিছু কিছু দিতেন। সেটা শুধু ঠাকুরের জন্য

ব্যয়িত হইত। সাধারণের জন্য তত চলিত না। তিন চার মাসের পর একটু অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল, কারণ তখন সুরেশ মিত্র, বলরাম বাবু, মাষ্টার মশায় চুপি চুপি জিনিষ পত্র দিতেন। শশী মহারাজ তখন বরানগরের বাজারে গিয়ে, নিজে কিছু আনাজ তরকারি কিনে আনতেন অর্থাৎ কাপড়ে ভাত ঢেলে খাওয়ার ভাবটা তখন চলে গেছে। এখন ভাত, ডাল, চচ্চড়ীর বন্দোবস্ত হয়েছে ও ভিন্ন ভিন্ন শাল পাতা করে সকলে খাচ্চে। এই সময় রামঠাকুর নামে একটী রসুইয়ে নিযুক্ত হ'ল, কিন্তু চাকর ছিল না। নরেন্দ্রনাথ, রাখাল মহারাজ, তারকদা প্রভৃতি সকলেই আবশ্যক মত হাণ্ডা ও কড়াগুলি মাজিয়া লইতেন এবং ফেলবার জল মাঠের পুকুর থেকে তুলিতেন। তবে খাবার জলের জন্য একটা ভারী জল দিয়ে যে'ত। চাকর থাকিবার কোন বন্দোবস্ত ছিল না বা রাখার বিষয় আবশ্যক জ্ঞানও করিত না; কারণ সে সময়ে একটা কথা ছিল যে, সকলেই সমান। কেউ কারুর চাকর নয়। কাপড় চোপড় যা'র যখন আবশ্যক হইত সে তখন একটা কাপড় নিয়ে পরিত। নিজস্ব বা ব্যক্তিগত ভাব কিছুই ছিল না। এইজন্য চাকর বা ছোট বড় জ্ঞান অতি দোষণীয় বিবেচিত হইত। সুরেশ মিত্র কাশীপুরে সওদাগরি আফিসে মুচ্ছুদ্দী ছিলেন। তিনি বিকালে আফিস হইতে একেবারে বরানগর মঠে যাইতেন এবং সন্ধ্যার প্রাক্কালে সিমলায় চলিয়া আসিতেন। আমিও অনেক

সময়ে সুরেশ মিত্রের গাড়ী করে সিমলায় ফিরিতাম ; কারণ আমি সর্ব্বদাই বিকালবেলায় বরানগর মঠে যাইতাম এবং সন্ধ্যার আগে চলিয়া আসিতাম। কোন কোন দিন রাত্রেও থাকিতাম। সুরেশ মিত্র রান্নাঘরে গিয়ে কি কি জিনিষ আছে বা নাই তা সমস্ত দেখতেন এবং রামঠাকুরকে বলে আসতেন, যখন যা জিনিষ দরকার পড়ে, যেন তাঁর বাড়ীতে গিয়ে সেই সমস্ত জিনিষ নিয়ে আসে। এইরূপ গোপনে সুরেশ মিত্র অনেক জিনিষ দিতে লাগিলেন। এই জন্য সুরেশ মিত্রের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। এই সময়ে সুরেশ মিত্র, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ যে বাড়ীতে দেহত্যাগ করেছিলেন সেই বাড়ীটী খরিদ করিয়া মঠ করিয়া দিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু মঠের কেহই ইহাতে সন্মত হন নাই। সকলেই বলিলেন, "এক বাড়ী ছেড়ে আর একটী বাড়ী করা কেবল মাত্র বিড়ম্বনা"। নিরঞ্জন মহারাজ বলিলেন, "সাধু ও সাপ পরের গর্ত্তে থাকে। কখন নিজে আবাস করে না।" একদিন বিকালে ফিরিবার সময় সুরেশ মিত্রের গাড়ীতে আমি ছিলাম ; নিরঞ্জন মহারাজ ও তারকদাও ছিলেন। কাশীপুরের সেই বাড়ীটার সামনে গাড়ী থামাইয়া সুরেশ মিত্র নিরঞ্জন মহারাজকে বাড়ীটী খরিদ করিয়া মঠ করিবার জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন ; কিন্তু নিরঞ্জন মহারাজ, তারকদা প্রভৃতি কেহই তাহাতে সম্মত হইলেন না। মঠ স্থাপনের প্রথম মুখে সুরেশ মিত্র পৃষ্ঠ-পোষক হ'য়ে দাঁড়িয়ে

ছিলেন, কারণ সেই রামদার সহিত কাঁকুড়গাছীর বাগান নিয়ে মনান্তর হইয়াছিল। গৃহীভক্তদিগের ভিতর অনেকের মত ছিল—ভিন্ন একটী মঠ করবার আবশ্যক নাই। কাঁকুড়গাছীর 'যোগোদ্যানে' যাহাদের ইচ্ছা হয় তাঁহারা গিয়ে থাকুন, যুবক-দিগের ভিতর অপর সকলে বাড়ী ফিরিয়া যাক; কিন্তু নরেন্দ্রনাথ, তারকনাথ, রাখাল প্রভৃতি যুবকেরা মঠ করিবেন ও সাধু হইয়া থাকিবেন—এই তাহাদের প্রবল ইচ্ছা ছিল। এইজন্য প্রথম অবস্থায় দুই শাখার ভিতর একটু মতভেদ হইয়াছিল। গিরীশ বাবু ভক্তলোক তাঁহাকে যে যেমন বুঝিয়ে দিতেন তিনি সেইরূপ বুঝিতেন। কখনও কাঁকুড়গাছীর দিকে মত করিতেন, কখনও বা মঠের দিকে মত করিতেন, তিনি কোন স্থির সিদ্ধান্তে প্রথম আসিতে পারেন নাই, কিন্তু আন্তরিক ভালবাসা মঠের উপর ছিল এবং কাঁকুড়গাছীর 'যোগোদ্যান' ও রামদার প্রতিও বিশেষ টান ছিল। বলরাম বাবু যদিও রামদা'র সহিত বিশেষ মেশামিশি করিতেন, কিন্তু তিনি মঠের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। এইজন্য বলরাম বাবু সর্ব্বদাই মঠে গিয়ে একবার দেখে আসতেন এবং যা দরকার হ'ত তা' নিজে পাঠিয়ে দিতেন। সুরেশ বাবু অবিচলিত। তিনি রামদা'র সহিত খুব মেলামেশা করতেন, তা হ'লেও তিনি মঠের দিকে সম্পূর্ণ ঝুঁকে ছিলেন। এই সময় মাষ্টার মশায় স্কুলের ফেরতা, চোগা চাপকান পরে, বরানগরের মঠে যেতেন

এবং রাত্তিরটা সেখানে থেকে সকাল বেলা চোগা চাপকান পরে পায়চারী কর্‌তে কর্‌তে সিমলায় ফিরে আস্‌তেন। আমি যে দিন রাত্রে মঠে থাক্‌তুম বা ভোর বেলা মঠে গিয়ে পোঁছতুম, মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে পায়চারী কর্‌তে কর্‌তে বাগবাজারে বলরামবাবুর বাড়ী হয়ে সিমলায় ফিরে আসতুম। যাহা হো'ক, সুরেশ মিত্র, বলরাম বাবু ও মাষ্টার মশায় মঠের পক্ষ হওয়ায় নিদারুণ তীব্র বৈরাগ্য বশতঃ যে কঠোর তপস্যা এবং অনাহারে ও অনিদ্রায় থাকার যে ভাবটা—সেটা অনেকটা কমে এল। মাষ্টার মশায় বরানগর মঠের প্রথম অবস্থায় কয়েক মাস রাত্রে মঠে ছিলেন; কিন্তু মাস কয়েক পর তাঁহার যাতায়াত তত রইল না, তবে মাঝে মাঝে যেতেন।

রামঠাকুর'ত রসুইয়ে হ'ল। এদিকে সুরেশ মিত্র গোপনে চাল ডাল আটা'ত দিতেন এবং বলরামবাবু ঠাকুরের সেবার দরুণ আলাদা বন্দোবস্তও করিতেন; কিন্তু সব সময় ভাঁড়ারে কিছু আছে কি না সে বিষয় ঠিক থাকিত না। সকলেই সাধন ভজন নিয়ে ব্যস্ত থাকিত। ভাঁড়ারের দিকে কাহারও লক্ষ্য ছিল না। এইজন্য যখন যাহা জুটিত তাহাই আহার করিয়া লইত।

যোগেন মহারাজের সর্ব্বত্যাগী মূর্ত্তি—

গরমীকাল, একদিন আমি বিকালবেলা মঠ থেকে ফিরে

আস্‌ছি। তখন বাগবাজারের খালের নিকট ইটের রেলের পুলটা হয়নি। গঙ্গার ধারে মস্‌জিদের পাশ দিয়ে বাগবাজার খালের কাছে আমরা আস্‌তুম। চিৎপুরের কাছে এলুম। রাস্তায় বড় ধুলো উড়্‌ছে, আর পাটের গাড়ী ভিড় করে যাতায়াত কর্‌ছে। দেখি না, যোগেন মহারাজ মঠে যাচ্চেন। লম্বা চেহারা, অতিশয় কৃশ, শুধু পা, একটা বহির্ব্বাস পরা, গায়ে কিছু আবরণ নেই, মাথা নেড়া। একটা ঝুলি করে পিঠে কি আনাজ তরকারী ঝুলিয়ে নিয়েচেন এবং ডান হাতে একটা হাঁড়ি করে কিছু রসগোল্লা নিয়েচেন। চিৎপুরে পাটের কলটার সাম্‌নে আমার সঙ্গে দেখা হ'ল। আমারত' দেখে বুকটা দমে গেল। যিনি দক্ষিণেশ্বরের সাবর্ণ চৌধুরীদের বাড়ীর ছেলে—তিনি কিনা নিতান্ত দীন হীনের ন্যায়, শুধু পায়ে, পিঠে ঝুলি নিয়ে এই দারুণ রৌদ্রে মঠে যাচ্চেন! মুখটায় দেখ্‌লুম কি স্নিগ্ধ, শান্ত ভাব! আর সে সাবর্ণ চৌধুরীদের বাড়ীর ছেলে নয়! জাত, কুল, মান আর কিছুই নাই! ভগবান লাভের জন্য যেন রাস্তার ভিখারী হয়েছেন। "দেবতা ভিখারী মানব দুয়ারে।" "Deny thy father, Deny thy name and for that which thou losest take all Myself" ভগবান যেন বল্‌ছেন যে, "নিজের বাপ বা বংশ মর্য্যাদা ত্যাগ কর, নিজের নাম, কুল ত্যাগ কর এবং এই ক্ষতির দরুণ সম্পূর্ণ ভাবে আমাকে পাইবে।" যদিও সেক্ষ-পিয়রের "রোমিও জুলিয়েট" পুস্তকে (Shakespeare's Romeo

Juliet) অর্চাড্ দৃশ্যে (Orchard Scene) এই কথাটী আছে তথাপি ইহার অন্য দিকেও অর্থ করা যায়। যোগেন মহারাজের এই সর্ব্বত্যাগী মূর্ত্তি এখনও যেন আমার চোখের উপর রয়েছে। সেণ্ট ফ্রান্সিস্‌এর (St. Francis) জীবনেও এইরূপ একটী ঘটনার উল্লেখ আছে। তিনিও এইরূপ নানা গ্রাম থেকে ভিক্ষে করে, আহার্য্য বস্তু নিয়ে নিজের আশ্রমে ফিরিতেছিলেন। যোগেন মহারাজের এই দৃশ্যটীর সহিত সেণ্ট ফ্রান্সিসের ঘটনাটীর বহু সৌসাদৃশ্য আছে।

শসা চুরি—

মঠবাড়ীর আশে পাশে অনেক পোড়ো জমি ছিল। কেলো মালী একটা উড়ে মালী। সে কিছু ক্ষেত করেছিল। সেই ক্ষেতে বড় বড় পাঁড় শসা হ'ত। মধুর বালক স্বভাব তারকদা এক একদিন চটে উঠ্‌তেন—"দুর্ তেরি ছাই! এমন দুধ্ চেটে খাওয়া আর খাওয়া যায় না।" এই বলে তিনি হাঁস্‌তে হাঁস্‌তে, সিঁড়ি দিয়ে নেমে কেলো মালীর ক্ষেতে যেতেন এবং দু'চারটা পাঁড় শসা তুলে আন্‌তেন। কেলো মালী সেই সময় ঘাপ্‌টি মেরে লুকিয়ে থাক্‌ত, সুমুখে আসত না। তা'র পরদিন, কেলোমালী এসে ন্যাকামি করে কান্না সুরু কর্‌ত। সে বল্‌ত, "আমি গরীব মানুষ, আমার শসা নিলেন! আমি এখন কি কর্‌ব!" সেটা কিন্তু মৌখিক ছিল। তারকদা কখনও কখনও দু'চার

খানি রুটী দিতেন। কখনও বা কোন ভক্ত আসিলে তাঁহাকে বলিয়া কেলো মালীকে একটা টাকা বা একখানা কাপড় দেওয়াইতেন। এই শসা তুলিবার সময় কখনও কখনও আমাকেও সঙ্গে নিতেন। সে একটা হাঁসি তামাসা, আমোদের জিনিষ ছিল। দু'চারটা শসা এনে তারকদা'র কি অহ্লাদ! কি হাঁসি! যেন কত দিগ্বিজয় হ'ল! তিনি ঘাড় নেড়ে নেড়ে, মুখ নেড়ে নেড়ে, ডান হাতের তর্জ্জনী নেড়ে নেড়ে যে হাঁসি তামাসা কর্‌তেন, তাহাতে সকলেই বড় আনন্দিত হ'তেন। সে চিত্র এখনও আমার স্বমুখে রয়েছে! যা হো'ক, সেই কেলো মালীর শসা একটু নুন ঝাল দিয়ে তরকারী হ'ত।

ভোঁদা শিয়াল—

তারকদা'র বরাবরই শিয়াল কুকুরের উপর একটা ভালবাসা ছিল। বরানগর মঠে কুকুর ছিল না, কিন্তু ঐ রকম কষ্টের অবস্থাতেও একটা শিয়ালকে উপরকার জানালা থেকে দু'চার খানা রুটী ফেলে দিতেন। শিয়ালটীর নাম রেখেছিলেন "ভোঁদা"। লোকের পাতের যে দু'একখানা রুটী পড়ে থাকৃত, এমন কি উনুনের কাছে থেকে একখানা রুটী চেয়ে নিয়েও, বরানগরের মঠে যে জলের ঘর বা খাবার যে ছোট ঘরটী ছিল, সেই ঘরের পশ্চিম দিকের বাগানের দিকের জানলার কাছে দাঁড়াতেন এবং 'ভোঁদা' 'ভোঁদা' বলে ডাক দিলে

একটা শিয়ালের বাচ্চা নীচে আস্‌ত এবং 'ঘোঁৎ' 'ঘোঁৎ' করে ডাক দিয়ে তা'র উপস্থিতি জানাত। তখন তারকদা উপর থেকে সেই রুটী ফেলে দিতেন। শিয়ালকে এই দু'একখানা রুটী উপর থেকে ফেলে দেওয়া তারকদা'র বালকের মত খেলা ও আমোদ ছিল। এতে তাঁ'র কি হাঁসি! কি আহ্লাদ! আবার জানালা থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখ্‌তেন, 'ভোঁদা' শিয়াল নিলে কি অপর শিয়াল নিয়ে গেল। এই শিয়ালকে রুটী দেওয়া রাত্রে তাঁ'র নিত্য কাজ ছিল। এই উপাখ্যান যে বলিলাম, সে তারকদা'র কি সরল ভাব ছিল, কি বালকের ন্যায় আনন্দ করিতেন, এমন কি সব সময়ে আনন্দেতে পরিপূর্ণ থাকিতেন—কঠোর জপ ধ্যান করিয়া, উচ্চ অবস্থা হইতে মনটাকে একবার নীচে নামাইবার জন্য তিনি কিরূপ বালকের ন্যায় আচরণ ও হাঁসি তামাসা করিতেন, এইটা দেখাইবার জন্য। তবে এইরূপ বালকের ন্যায় হাঁসি তামাসা অল্পক্ষণের জন্য করিয়াই আবার স্থির অন্তঃদৃষ্টি পরিপূর্ণ লোক হইয়া যাইতেন। ইহা শুধু মনের গতিটা একটু পরিবর্ত্তন করিবার জন্য সাময়িক ভাবে করিতেন। কখনও বা তিনি কাহারও সহিত খুন্‌সুড়ি করিতেন। কখনও বা কাহাকেও ব্যঙ্গ করিতেন। কখনও বা কাহারও নকল করিয়া হাত, মুখ ও কথার ভঙ্গী ইত্যাদি করিয়া একটু ঝগড়া করিতেন। এইরূপ করিয়া নিজে খানিকটা হেঁসে নিতেন এবং অপরেও

খানিকটা হাঁস্‌ত। খুনসুড়ি করার কোন উদ্দেশ্য নাই, তবে হাঁসাই কেবল উদ্দেশ্য—মনটাকে একটু নীচু স্তরে আনাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল; কারণ এই সময় তিনি কঠোর তপস্যা করিতেন এবং মনটা একেবারে উচ্চস্তরে থাকিত। সর্ব্বদাই তিনি ঘোর ঘোর অবস্থায় বিভোর হইয়া থাকিতেন। সম্পূর্ণ অন্তঃদৃষ্টি সম্পন্ন এবং দেহ থেকে পৃথক হইয়া যেন অন্য স্থানে রহিয়াছেন। এইজন্য, তাঁর মাঝে মাঝে হাঁসি তামাসা ও ব্যঙ্গ করা ঔষধের ন্যায় আবশ্যক হইত।

বেলতলায় সন্ন্যাস লওয়া—

বরানগর মঠে প্রথম অবস্থাতে প্রায় সকলেই বেলতলায় বিরজা হোম করে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন; কিন্তু তখন এ বিষয় তত প্রকাশ পায়নি, যে যাঁ'র পুরাণ নামেই চলিতেন এবং সাদাধুতি পরিতেন—খানিকটা পরা আর খানিকটা গায়ে দেওয়া। গিরীশ বাবুর ঘরেতে, একদিন বিকাল বেলা, তাঁর ভাই অতুল বাবু বল্‌লেন, "কি নিরঞ্জন, তুমি না কি সন্ন্যাস নিয়ে কি একটা নাম করেছ?" নিরঞ্জন মহারাজ হাঁস্‌তে হাঁস্‌তে বললেন, "হ্যাঁ হে, অতুল! আমি বিরজা হোম করে সন্ন্যাস নিয়েছি। আমি নিরঞ্জনানন্দ নাম নিয়েছি।" কিন্তু এ কথার তখন বিশেষ সার্থকতা ছিল না, কারণ তখন গৃহীভক্ত ও ত্যাগী ভক্তদের ভিতর বিশেষ কোন প্রভেদ ছিল

I

না। সকলেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত এবং সকলেই নিজের সাধ্য অনুযায়ী জপ, ধ্যান ও তপস্যা করিতেন—কেউ কিছু বেশী করিতেন আর কেউ কিছু কম করিতেন মাত্র। সকলে একত্রিত হইলেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের কথাবার্ত্তা বিশেষ করিয়া আলোচনা করিতেন। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন কথা বা প্রসঙ্গ তেমন চলিত না। পরে 'মঠ' বলে যখন একটা পাকাপাকি হ'ল এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকটী ত্যাগী যুবা শিষ্য একত্রিত হইয়া ধর্ম্মের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল, তখন সকলের ভিতর 'গৃহী' ও "সাধু" বলিয়া একটা ভাব উঠিল।

বরানগর মঠেতে প্রথমে সকলের এক একখানা করে কাপড় ছিল আর জোড়া কতক চটিজুতা ছিল; কিন্তু ক্রমে ক্রমে পায়ে জুতা দেওয়া সকলে ত্যাগ করিলেন—শুধু পায়ে বেড়াইতেন। তারপর কাপড় দু'টুকরা করে বহির্ব্বাস করিয়া পরিতে লাগিলেন এবং ভিতরে একটা করে কৌপীন থাকিত। ক্রমে বহির্ব্বাস ছিঁড়িয়া যাইল। মোট দুইখানা বহির্ব্বাসে ঠেকিল। যিনি বাড়ীর বাহিরে যাইতেন তিনি কৌপীনের উপরি একখানা বহির্ব্বাস পরে বেরুতেন; কিন্তু যাঁহারা ভিতরে থাকিতেন তাঁহারা কৌপীন পরিয়াই থাকিতেন। অবশেষে কৌপীনও ছিঁড়িয়া গেল। মহা বৈরাগ্য—কাউকে কিছু মুখে ফুটিবেন না বা বলিবেন না! এইজন্য অনেকেই

বাড়ীর ভিতর কৌপীন পরাও ছাড়িয়া দিলেন। এটা হ'ল গরমীর শেষ ভাগ থেকে বর্ষা পর্য্যন্ত অর্থাৎ মঠ হইবার দ্বিতীয় বৎসরের কথা। আমি বিকাল বেলা যখন যাইতাম, প্রথম প্রথম সকলকে উলঙ্গ দেখিয়া একটু লজ্জিত হইতাম'। নিরঞ্জন মহারাজ ও তারকদা বড় ঘরটীতে দাঁড়িয়ে আমাকে বল্‌লেন, "কিরে! আমাদের ন্যাংটো দেখে তোর লজ্জা হচ্চে? আমরা সাধু হয়েছি, আমাদের আর লজ্জা বলে কিছু নেই!" কিন্তু সকলকেই উলঙ্গ দেখায় দু'চার মিনিট পরেই আর বিশেষ কিছু সঙ্কোচ ভাব রহিল না, যেমন স্বাভাবিক তেমনি স্বাভাবিক, বেশ কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। বর্ষা আরম্ভ হয়েছে, সুরেশ মিত্র আফিসের ফের্‌তা মঠে যাইলেন। নিরঞ্জন মহারাজ, শশী মহারাজ ও তারকদা সুরেশ মিত্রের সম্মুখে উলঙ্গ হইয়া রহিলেন। নরেন্দ্রনাথ তখন বাহিরের ঘরটাতে একটা চ্যাটাইয়ের উপর শুয়ে ছিলেন, আমি সেই ঘরটীতে গেলুম। আমাকে বল্লেন, "গায়ে একটু হাত বুলিয়ে দেতো!" আমি গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলুম। এমন সময় সুরেশ মিত্রের ঘরে ঢুকিবার গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। সুরেশ মিত্র নরেন্দ্রনাথের পাশের বাড়ীর লোক ও বয়সে বড়। সুরেশ মিত্রের সুমুখে নরেন্দ্রনাথ পাড়া হিসাবে একটু সঙ্কোচ করে থাক্‌তেন। এইজন্য আমাকে বল্লেন, "একটা কাপড় নিয়ে আয় দিকিনি!" আমি বড় ঘর থেকে একটা বহির্ব্বাস এনে দিলুম। নরেন্দ্রনাথ

তখন শুয়ে শুয়ে ধ্যান কর্‌ছিলেন ; এইজন্য না উঠিয়া শুইয়াই রহিলেন এবং কোমরের উপর কাপড় খানা রাখিলেন, কিন্তু কাপড় খানা ঘুরিয়ে পর্‌লেন না। সুরেশ মিত্র খানিকক্ষণ কথাবার্ত্তা কয়ে চলে এলেন। আমিও বৃষ্টি বাদলের দিন সন্ধ্যার সময় তাঁহার গাড়ী করে সিমলায় আসিলাম। এইটী হইতেছে তীব্র বৈরাগ্যের জ্বলন্ত উদাহরণ। তখনকার দিনে ঈশ্বর লাভই ছিল একমাত্র উদ্দেশ্য—আর বাকী সব জিনিষই ছিল তুচ্ছ। অল্পদিন পরে মোটামুটি আবশ্যকীয় সব জিনিষ আসিয়া গেল এবং যে যাঁর নিজ নিজ কৌপীন ও বহির্ব্বাস পরিতে লাগিলেন। এইরূপ কৌপীন বিহীন হইয়া থাকার ভাবটা তিন চার মাস ছিল। বর্ষার শেষ সময় বা শরতের প্রথমেতেই কৌপীন ও বহির্ব্বাস আসিয়া গেল।

প্রণাম অস্ত্র—

তখনকার দিনে প্রণামের প্রথা ছিল দুই হাত জোড় করিয়া তুলিয়া নিজের কপাল স্পর্শ করা এবং মুখে বলা "পাঞোমে পড়্‌না মহারাজ, মাথা টেক্‌না মহারাজ!" এটী পাঞ্জাবী প্রথা। সুরেশ মিত্র এই কথাটী সর্ব্বদা ব্যবহার করিতেন। আগন্তুক ব্যক্তি প্রণাম করিবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে প্রণাম করিতে হইত। এমন কি পরস্পর হঠাৎ দেখা হইলেও পরস্পরকে প্রণাম করিতে হইত। এ বিষয়ে একটী উপাখ্যান আছে।

গিরীশবাবু একদিন বলিলেন যে, তিনি বোস্‌পাড়ার গলির মোড়টাতে রকের উপর বসিয়া আছেন। বিকালবেলা পরমহংস মশায় দক্ষিণেশ্বর হইতে গাড়ী ক'রে বলরাম বাবুর বাড়ী যাইতেছেন। গিরীশবাবুর সঙ্গে চৌমাথার মোড়ে দেখা হ'ল। গিরীশবাবু রকে দাঁড়াইয়া উঠিয়া চটিজুতা পায়ে দিয়া পরমহংস মশায়কে প্রণাম কর্‌লেন; কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই পরমহংস মশায় গিরীশবাবুকে প্রণাম করিয়াছেন। গিরীশবাবু পুনর্ব্বার প্রণাম করিলেন। পরমহংস মশায় আবার প্রণাম করিলেন। এইরূপ প্রণাম করাতে গিরীশবাবু পরমহংস মশায়ের কাছে পরাস্ত হইলেন অর্থাৎ গিরীশবাবুর প্রণাম করিবার পূর্ব্বেই পরমহংস মশায় প্রণাম করিতে লাগিলেন। এইরূপ বারম্বার হওয়ায় গিরীশবাবুর ঘাড় ব্যথা করিতে লাগিল। তিনি ক্ষান্ত হইলেন; কিন্তু পরমহংস মশায় ত'ার পরেও তাঁ'কে প্রণাম করিলেন। গিরীশবাবু তখন মনে করিতে লাগিলেন যে, "দক্ষিণেশ্বরের পাগলা বামুনটার সঙ্গে আর প্রণাম করা চলে না! ওটা পাগলা বামুন, ওর ঘাড়ে ব্যথা হয় না!" এইরূপ মনে ক'রে তিনি স্থির হইয়া রহিলেন। গাড়ীখানা বলরামবাবুর বাড়ীর দিকে চ'লে গেল। একদিন সন্ধ্যার সময় বলরামবাবুর বড় ঘরটীতে বসে গিরীশবাবু এই ঘটনাটী বলিয়াছিলেন এবং আরও বলিলেন, "রাম অবতারে ধনুর্ব্বাণ নিয়ে জগত জয় হয়েছিল, কৃষ্ণ অবতারে বাঁশীর ধ্বনিতে জগত জয় হয়েছিল; কিন্তু রামকৃষ্ণ অবতারে

প্রণাম অস্ত্র দিয়ে জগত জয় হ'বে।" গিরীশবাবু সে দিন এই প্রণামের এমন সুন্দর ব্যাখ্যা কবেছিলেন যে, আমরা সকলে শুনিয়া স্তম্ভিত ও অবাক হইয়া রহিলাম।

এইজন্য বরানগরের মঠে পরস্পরকে এইরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি ক'রে প্রণাম করিতে হইত। আর একটা কথা, সে সময়ে কলিকাতার যুবকদিগের ভিতর এবং শিক্ষিত লোকদিগের ভিতর হাত তুলে প্রণাম করার প্রথা একেবারে উঠিয়া গিয়াছিল। তখন সকলে ইহাকে অসভ্যতা মনে করিত। বড় বেশী হ'লে ডান হাতের একটা আঙ্গুল তুলিয়া কপালে ঠেকাইত, কিন্তু এইটাও নিতান্ত অনিচ্ছায় করিত। পরমহংস মশায় দু'হাত তুলে প্রণাম করার প্রথাটা পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিলেন। এইজন্য, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তদিগের ভিতর এই হাত তুলিয়া প্রণামের প্রথাটা এত প্রবল বেগে চলিয়াছিল এবং সকলেই সকলকে "পাঞোমে পড়্না মহারাজ, মাথা টেক্না মহারাজ!" এই বলিয়া অভিবাদন করিত।

পরামাণিকের ঘাটে নাইতে যাওয়া—

পরামাণিকের ঘাটে যখন সকলে স্নান করিতে যাইত তখন পাড়ার দুষ্ট ছেলেগুলো অনেকের প্রতি, বিশেষতঃ শশী মহারাজের প্রতি, ব্যঙ্গ করিত। পিছন থেকে এসে ছেলেগুলো কহিত, "হংস, রাজহংস, প্যাঁক্ প্যাঁক্ প্যাঁক্!" কিন্তু অল্প দিনের

ভিতরেই শশী মহারাজের অমায়িক ভাব ও ভালবাসা দর্শনে ছেলেরা বড় অনুগত হইল এবং তাঁহাকে অতি শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে লাগিল। স্নান করিবার সময় গঙ্গায় গিয়ে গোটাকতক ডুব দিত। গা, মাথাটা ভিজান মাত্র। গামছা কাহারও ছিল না, আর তাহার আবশ্যক বোধও ছিল না। গা ঘসা বা গা মাজা এ সব কিছুই ছিল না অর্থাৎ উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তের লোক যেরূপ করিয়া থাকে—গায়ে ধুলো কাদা যেমন তেমনই রহিল! মাথায় ঝাঁক্‌ড়া ঝাঁক্‌ড়া চুল ও গালে কোঁকড়ান কোঁকড়ান দাড়ি। নাপিত দিয়ে খেউরি করিবারও কা'রও বিশেষ খেয়াল ছিল না, তবে কলিকাতায় আসিলে নাপিত সুমুখে দেখিলে মাথা, দাড়ী কামিয়ে নিত। এই সময় যেখানে সেখানে পড়ে জপ ধ্যান কর্‌ত ; পরিষ্কার জায়গা বা ঝাঁট দেওয়া জায়গা এ সবের কোন খেয়ালই ছিল না। বিশেষতঃ, ধুনি জ্বালিয়ে অনেকক্ষণ জপ করিত। এমন কি পরামাণিক ঘাটের শ্মশানে গিয়ে সমস্ত রাত্রি জপ করিত। নরেন্দ্রনাথ ও শরৎ মহারাজ দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতে গিয়ে ধুনি জ্বালিয়ে কখনও কখনও সমস্ত রাত্রি জপ কর্‌তেন। তখন জপ ধ্যানটাই একমাত্র প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। আর আহার বা শরীর রক্ষা—ইহা নিতান্ত অনাবশ্যক বস্তু বলিয়া গণ্য হইত। জুতা কারও পায়ে ছিল না। আর যা জোড়াকতক চটিজুতা ছিল তাহাও কেহ ব্যবহার করিত না। একদিন আশ্বিন মাসের শেষ বা কার্ত্তিকের প্রথম

সময় তারকদা সকালে রামতনু বোসের গলির বাড়ীতে আসিলেন। তারকদা'র গায়ে ধুলো কাদাতে মোটা সরের মতন একটা নেউনি পড়ে গেছে, মাথায় উড়ি খুড়ি চুল, আর কোঁক-ড়ান কোঁকড়ান দাড়ি। আমি বল্লুম, "তারকদা, চল তোমায় নাইয়ে দি'।" সেই সময় দিল্লী থেকে একজন গা মাজ্‌বার গেঁজে বা বগলী, যাহাকে "খিস্‌সে" বলে—সেইটে এনেছিল। আমি তারকদা'কে কলের নীচে বসিয়ে নিজের হাতে সেই বগলীটা প'রে তারকদা'র গা ঘস্‌তে লাগ্‌লুম। গা ঘস্‌তে ঘস্‌তে কাদাটে জল বেরুতে লাগল। এইরূপ অনেকক্ষণ পিঠ, বুক, হাত, পা, মুখ ঘসে গায়ের চামড়ার রং বেরুলো। আমি বল্‌লুম, "তারকদা, এত কাদা বেরুচ্ছে কেন?" তারকদা বল্‌লেন, "সমস্ত রাত্রি ধুনির পাশে বসে জপ করি, আর দিনের বেলায় গঙ্গায় তিনটা ডুব দিয়ে আসি। গাও ঘসিনি গাও পুঁছিনি, যেখানে সেখানে পড়ে থাকি সেইজন্যে গায়ে এত কাদা লেগেছে।" তারপর তিনি বল্লেন, "ওহে! একটু গুল দাও দিকিনি? দাঁতটা মাজি, অনেক দিন দাঁত মাজ্‌তে ভুলে গেছি!" আমি তখন একটু গুল গুঁড়িয়ে এনে দিলুম। তখন তারকদা'র জোয়ান বয়স, রং উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, গা ঘসে দেবার পর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখ্‌তে হ'ল; কিন্তু দেহ অতিশয় কৃশ হয়ে গিছ্‌ল। তারপর কাপড় চোপড় রোদে শুকুতে দিলুম। তারকদা ঘরের ভিতর গিয়ে একটু শুলেন। দেখি না,

পায়ের গোড়ালীগুলো একেবারে ফেটে গেছে। আমি নারিকেল তেল এনে সেই ফাটাগুলোর ভিতর দিতে লাগ্‌লুম। তারকদা একটু হেঁসে বল্‌লেন, "ওহে! তুমি একদিন দিয়ে আর কি কর্‌বে? আমায় সর্ব্বদাই এই রকম অবস্থায় থাকতে হয়! পা টা ফেটে গেছে এতে আর কি ক্ষতি হয়েছে?" যাহা হউক, তারকদা আহারাদি করে চলে গেলেন। এই সময়ে তিনি সাধন ভজনে বিভোর হইয়া থাক্‌তেন, দেহের দিকে কিছুই মন ছিল না।

গঙ্গায় ঠিকুজি ফেলে দেওয়া—

বেলুর মঠে কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তারকদা, তোমার জন্মতিথি কি?" তারকদা বল্‌লেন, "আমার একটা ঠিকুজি ছিল। তা বরানগর মঠেতে একদিন পরামাণিকের ঘাটে গিয়ে সেটা গঙ্গায় ফেলে দিলুম। আরে! যদি আমই বিক্রী হ'য়ে গেল তো খালি ঝোড়াটা নিয়ে আর কি কর্‌ব? ঝোড়াটাও ফেলে দিয়েছি! তখন তীব্র বৈরাগ্যের ভাব, তখন অন্য কোন জিনিষই ভাল লাগ্‌ত না। জগতের সব ত্যাগ কর্‌লুম, আর একটা ঠিকুজির মায়া কি থাকে?" এই বলিয়া তিনি হাঁসিতে লাগিলেন।

"বাবু" ও "মহারাজ"—

বরানগরের মঠে পরস্পরকে নাম ধরে বা "বাবু" বলে ডাকা হ'ত। যার সঙ্গে যেমন সম্বন্ধ, যেমন সাধারণে পরস্পরকে

সম্বোধন করিয়া থাকে সেইরূপই হইত। তারপর পশ্চিমে যাওয়ার দরুণ বলরামবাবু মাঝে মাঝে "স্বামী" বলে ডাকিতেন— যেমন "নরেন স্বামী" "যোগেন স্বামী।" সেটা কখনও কখনও ভক্তিভাবে সম্মান দেখাবার জন্য ; কিন্তু সচরাচর নাম ধরে বা "বাবু" বলে ডাক্‌তেন। "মহারাজ" শব্দটা আলমবাজারের মঠের শেষভাগে বা বেলুড় মঠে হয়েছে। গুপ্ত মহারাজ একবার বলেছিলেন যে তিনি পশ্চিমের জোয়ানপুরের লোক, হিন্দি তাঁর স্বাভাবিক ভাষা এবং 'মহারাজ' শব্দটা তিনিই প্রচলন করেন ; কারণ পশ্চিমে এই 'মহারাজ' শব্দটার বহুল পরিমাণে প্রচলন আছে। হইতে পারে গুপ্ত মহারাজ এই কথাটা প্রচলন করেন, তবে এ বিষয়ে কোনও স্থিরতা নাই।

নাদ ব্রহ্ম—

শ্রাবণ বা ভাদ্র মাস হইবে, একদিন বিকালবেলা আমি বরানগর মঠে গেলুম। মেঘলা করেছে। ঝিম্ ঝিম্ বৃষ্টি হচ্ছিল। বড় ম্যালেরিয়া হওয়ায় সকলেই বাইরে পালিয়েছে। শশী মহারাজ ঠাকুরঘরে ঠাকুরের সন্ধ্যা আরতির উদ্যোগ করিতেছেন। বড় ঘরটাতে তারকদা ও শরৎ মহারাজ আছেন। তারকদা দক্ষিণ দিকের দেওয়ালেতে পিছন করে বাঁ দিকের হাতে মাথা রেখে বেঁকে শুয়ে আছেন। শরৎ মহারাজ একটু দূরে আধশোয়া হ'য়ে হাতে মাথা রেখে শুয়ে রয়েছেন। আমি

কাছে গিয়ে বসলুম। বৃষ্টির জল পড়ায় বাগানের আম পাতা থেকে টোপে টোপে জল গড়াচ্ছে, বাড়ী নিস্তব্ধ। তু'জনের যেন মুখ ভাবে বিভোর ও বিষাদে পরিপূর্ণ, চক্ষুতে জল ভরে রয়েছে এবং যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন। খানিকক্ষণ পরে তারকদা বল্‌লেন, "শরৎ, বাঁয়াটা পাড়োতো, ঠেকা দাওতো।" তারকদা উঠে বসে গাইতে লাগ্‌লেন ঃ—

"হরি গেল মধুপুরী, হাম কুলবালা,
বিপথ পড়ল, সহি! মালতীমালা;
নয়নক ইন্দু তুমি, বয়ানক হাস্‌,
সুখ গেল প্রিয় সাথে, তুঃখ মোহি পাশ্‌!"

তারকদা প্রাণের আবেগে এই বিরহটী এমন সুন্দর গাইতে লাগিলেন যে, আমার পর্য্যন্ত মন দ্রব হ'য়ে গেল! আর তারকদা'র ও শরৎ মহারাজের উভয়েরই চোখ দিয়ে জল গড়াইতে লাগিল—"নয়ন জলে বয়ান ভাসে।" হৃদয়বিদারক বিরহ যে কি জিনিষ এবং কৃষ্ণ বিরহে রাধিকা যে অতি করুণ স্বরে বিলাপ করেছিলেন তাহা যেন চোখের উপর স্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল। এইরূপ করুণ স্বরে বিরহ সঙ্গীত প্রায় শুনিতে পাওয়া যায় না। ইহার সহিত সঙ্গীতের বিশেষ সম্পর্ক নাই। ইহা হইতেছে নাদ ব্রহ্ম—যাহা হৃদয় হইতে উদ্ভূত হইয়া কণ্ঠ দিয়া প্রকাশ হয়েছিল। সেই সঙ্গীত গাওয়া ও শুনাতে

আমরা তিনজনেই স্তম্ভিত হইয়াছিলাম। অন্তরে যেন বিরহ-ভাবের তরঙ্গ চলিতে লাগিল। পক্ষান্তরে, ইহা তারকদা ও শরৎ মহারাজের সাধক জীবনের অন্যতম রূপ; কারণ তাঁহাদের প্রাণও তখন ভগবান লাভের জন্য আকুলি বিকুলি করিতেছিল। এইজন্য নিজেদের হৃদ্‌গত ভাবে নিজেরাই সুর করিয়া ভজন গাহিয়াছিলেন। শেষ সময়ে একদিন কথাপ্রসঙ্গে শরৎ মহা-রাজকে বলিলাম, "বরানগর মঠে, সেই যে ভজন হয়েছিল আর কেঁদেছিলে মনে আছে?" শরৎ মহারাজ হাঁসিতে হাঁসিতে বলিলেন, "সেটা খুব মনে আছে, প্রাণে বড্ড ধাক্কা লেগেছিল।"

অশরীরিবাণীতে সঙ্গীত—

বৌদ্ধগ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে যে, কুমার সিদ্ধার্থ যখন গৃহে ছিলেন তখন তিনি এক সময় অশরীরিবাণীতে একটী সঙ্গীত শুনিয়াছিলেন এবং তাহাতেই তাঁহার বৈরাগ্যের ভাব উদয় হওয়ায় তিনি গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। এইরূপ বর্ণিত আছে যে, "শুদ্ধ-বাস-কায়িকা দেবপুত্রা" অশরীরি-অবস্থায় শূন্যপথে এই সঙ্গীত গাহিয়াছিলেন। কেবলমাত্র কুমার সিদ্ধার্থ ইহা শুনিতে পাইয়াছিলেন, অপর কেহ ইহা শুনিতে পান নাই। এই সময় মন্ত্রীপুত্র উদঞির সহিত সিদ্ধার্থের নানাবিষয়ে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল;—তাহা "Romantic Life of Gautama Budha" নামক গ্রন্থখানিতে পাওয়া যায়। এই

সব উপাখ্যান জানা থাকিলে, মুমুক্ষু সাধক তারকনাথের ভিতর যে তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছিল ও তাহার সহিত বুদ্ধের বৈরাগ্যের যে অনেক সৌসাদৃশ্য আছে—পাঠক তাহা দেখিতে পাইবেন।

সঙ্গীত—

গিরীশ বাবুর "বুদ্ধদেব চরিতে" যে বিখ্যাত গান—"জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই" ইত্যাদি—এইটী তারকদা ও মঠের প্রায় সকলেরই অতি প্রিয় ছিল। তারকদা মনটায় কিছু হইলেই বিভোর হইয়া এই গানটী গাইতেন। এটা এমন মিষ্ট করে তিনি গাইতে পারিতেন যে যতবারই শুনিতাম ততবারই ভাল লাগিত। বেলুড় মঠে একদিন বৈকালে কথাপ্রসঙ্গে বলিলাম, "তারকদা, তোমার সেই 'জুড়াইতে চাই" গানটা আগে বড় মিষ্ট লাগ্‌ত, একবার গাওনা ?" তারকদা অনুরোধ রক্ষা কর্‌বার জন্য একবার গাইলেন, কিন্তু সে রকম হ'ল না। আমি বল্‌লুম, "তারকদা, এত সে রকম হ'ল না!" তারকদা ঈষৎ হাঁস্‌তে হাঁস্‌তে বল্‌লেন, "আরে! সে জোয়ান বয়সে গাইতুম, আর এখন বুড়ো হয়েছি, এখন কি আর সে ক্ষমতা আছে ? দেখ, আমার নিজেরও ভাল লাগ্‌ল না! এ যেন কেমন একটা কর্কশ, বেখাপ্পা হ'য়ে গেল! আর কি জান ? তখন তীব্র বৈরাগ্যের

ভাব! এই গানটা প্রাণের ভাষা—সেইজন্য তখন এই গানটা এত মিষ্ট লাগ্‌ত!"

তিনি এক এক সময় এক এক বিষয়ের গান গাইতেন; তা'র মধ্য হইতে দু' একটী গানের নাম উল্লেখ করিতেছি—"তেরা বনত বনত বন্ যায়ী", "গঙ্গাধর মহাদেব শুন পুকার মেরী।" ইহা ছাড়া তিনি অন্য অনেক গানও গাইতেন।

মঠের সকলের মনে একটা সন্দেহ আসা—

প্রথম কয়েক মাস কঠোর তপস্যা করায়, অনাহারে ও অনিদ্রায় থাকায়, ভদ্রলোকের ছেলেদের, বিশেষতঃ, কলেজে পড়া ছেলেদের মন বিষণ্ণ হইয়া পড়িল। বাড়ী ঘর দোর সব ছাড়্‌লে, কিন্তু এদিকে'ত কিছু দেখ্‌তে পেলে না। লাভ হ'ল ভিক্ষা ক'রে খাওয়া, আর ধুলোয় কাদায় পড়ে থাকা! এইজন্য অনেকেরই মনটা একটু চঞ্চল হ'য়েছিল—মঠে থাকা উচিত, না যে যার বাড়ী ফিরে যাওয়া আবশ্যক? —স্বভাবতঃই লোকের মনে এরূপ একটা সংশয় আসিতে পারে। আর এইটা হইতেছে প্রথম মাস তিন-চারেকের ভিতরের কথা। নরেন্দ্রনাথ শশী মহারাজকে বলিলেন, "শশী, একটা বাইবেল আন্ দিকিন্।" নরেন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ স্থির হ'য়ে ধ্যান করিলেন, তারপর বাইবেলের একটা জায়গায় হাত দিয়ে পাতাটা খুলে ফেল্‌লেন এবং একটা জায়গায় আঙ্গুল দিয়ে বল্‌লেন, "শশী, এই জায়গাটা

পড়্ দিকিন্।” শশী মহারাজ সে জায়গাটা পড়্‌লেন—তাহাতে লেখা আছে, “He that puteth his hand unto the plough and looketh back shall never reap the harvest.” অর্থাৎ লাঙ্গলে হাত দিয়ে, মাটী চ’ষতে গিয়ে যে অন্যদিকে মন দেয় তার ফসল কখনও হয় না। এই আশাপ্রদ বাণী শুনে নরেন্দ্রনাথ’ত স্থির-সঙ্কল্প হ’য়ে অতি গম্ভীরভাবে বলিলেন, “সকলেও যদি বাড়ী ফিরে চলে যায়’ত যাক্। আমি কিন্তু আর বাড়ী ফির্‌ব না। আমি যে পথ অবলম্বন করেছি সেই পথেই থাক্‌ব।” তিনি এই কথাটা, এমন স্থির গম্ভীর সিংহনাদে বলিয়াছিলেন যে, সকলেই স্তম্ভিত হইয়া উঠিল এবং সকলের মনে যে একটা দুর্ব্বলতার ভাব এসেছিল সেটা তিরোহিত হ’ল। একেই বলে “Leader’s firmness and deciding capacity”—ইহাই হইতেছে অধিনেতার দৃঢ়চিত্ততা ও উপায় উদ্ভাবন করবার ক্ষমতা—নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি। সমস্ত হাওয়া যেন পরিষ্কার হয়ে গেল।

এই ঘটনার দিন দুই পরে নরেন্দ্রনাথ রামতনু বসুর গলির বাড়ীতে সকালে আসিলেন। আমাকে বল্‌লেন, একটা বাইবেল নিয়ে আয় তো রে! আমি বাইবেলটা এনে দিলুম। তিনি অনেকক্ষণ ধ্যান করে আমাকে বল্‌লেন, “এই জায়গাটা পড়্ দিকিনি। আমি পড়্‌লুম, তাহাতেও ঐরূপ আশাপ্রদ বাণী ছিল। সে ছত্রটা এখন আমার স্মরণ নেই। যাহা হউক, নরেন্দ্রনাথ অতি গম্ভীরভাবে আপনা আপনি বলিয়া উঠিলেন, ‘যা কর্‌বো

তা স্থির করিছি—হিমালয় যদি ট'লে পড়ে ত আমি নড়্‌বো না, স্থিরপ্রতিজ্ঞ হ'য়ে কাজ কর্‌বো—এতে প্রাণ থাকে আর প্রাণ যায়!' এইটে তিনি উচ্ছ্বাসভাবে বলে ফেল্‌লেন। এই কথাটি মঠের সকলের বিশেষ মন দিয়ে জেনে রাখা আবশ্যক বোধ ক'রে উল্লেখ করিলাম। এটা ঠিক যেন নরেন্দ্রনাথের প্রতি অশরীরিবাণীর আদেশ স্বরূপ হইয়াছিল। আর একটী কথা, শশী মহারাজের মনে কখন কোন দ্বিধা বা সংশয় উঠিলে, তিনি বাইবেল থেকে আদেশ গ্রহণ করিতেন। বাইবেল খুলিয়া একটা আদেশ লওয়ার অভ্যাসটা তাঁ'র জীবনের শেষ পর্য্যন্ত ছিল। ইহাকে ইংরাজীতে Bibliography বলে।

সারদা মহারাজকে স্পর্শ করিয়া থাকা—

এই সময় সারদা মহারাজ (স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ) কঠোর জপ-ধ্যান স্বুরু করিলেন। বাইরের ছোট ঘরটীতে দরজা বন্ধ ক'রে অনবরত জপ করিতেন। এমন কি আহারাদিও ত্যাগ করিলেন। গরমীকাল, একদিন রবিবার সকালে আমি মঠে গেলুম। সকলে খাবার ঘরটাতে গিয়ে প্রসাদ পাওয়া গেল। সে দিনে হয়েছিল ভাত, খুব ঝাল দেওয়া চাপ্‌ চাপ্‌ মুগের ডাল, আর কুমড়া লতাপাতা দিয়ে একটা চচ্চড়ি। ডালটাতে বেশ সোঁদা সোঁদা গন্ধ হয়েছিল, আর আস্ত লঙ্কাও ছিল। আমার মুখে বেশ লেগে ছিল। সঙ্গে দাশরথি সান্ন্যাল (যিনি

হাইকোর্টের বড় উকীল হয়েছিলেন) এবং বরানগরের সাতকড়ি মৈত্র, উপস্থিত ছিলেন। যাহা হউক, সকলে আহারাদি করিয়া উঠিলেন, কিন্তু সারদা মহারাজ আহার করিতে আসিলেন না। তারকদা তখন মঠের কর্ত্তা, সকল বিষয়ই তাঁ'কে খবর রাখ্‌তে হ'ত। তিনি বাহিরের ছোট ঘরটীর দিকে চলিলেন। আমিও পিছনে পিছনে চলিলাম। অনেক দোর ঠেলাঠেলি ক'রে সারদা মহারাজ দরজাটা খুল্‌লেন, কিন্তু বল্লেন জপ ছেড়ে তিনি খাবেন না। শেষটা সারদা মহারাজ এই স্থির কর্‌লেন যে, তারকদা যদি তাঁ'র গা স্পর্শ ক'রে থাকেন তা' হ'লে সেটা জপের কাজ হবে। এই হিসাবে তিনি দশ পনের মিনিটের মধ্যে আহার করিয়া লইলেন। অগত্যা তারকদা সারদা মহারাজের গায়ে হাত দিয়া চলিলেন এবং আহারের সময়ে গায়ে হাত দিয়া বসিয়া রহিলেন। উপখ্যানটী থেকে বেশ স্পষ্ট বোঝা যায় যে, মঠের সকলে তারকদা'কে কি সম্মান করিতেন, কি উচ্চ আসন দিতেন—তাঁ'র স্পর্শ ক'রে থাকাই জপের সমান হইবে! নরেন্দ্রনাথের পরেই সকলে তারকদা'কে বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন ও উচ্চ স্থান দিতেন।

চা খাওয়া—

বরানগর মঠে, একদিন সকালবেলা দাশরথি সান্ন্যালের বাড়ী যাইলাম। দাশরথি সান্ন্যালের বাড়ী পরামাণিক

ঘাটের গলিতে; মঠ-বাড়ী থেকে কিঞ্চিৎ পশ্চিমে। সেখানে বসে চা খাইলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি এত চা খেতে শিখ্‌লে কোথায়?" দাশরথি সান্ন্যাল হাঁসিয়া বলিল, "তোমাদের বাড়ী থেকে? তোমাদের বাড়ীতে যে চা খাবার হিড়িক ছিল, তাই অভ্যাস হ'য়ে গেছে!" বক্তব্য এই যে, মঠে নরেন্দ্রনাথ তাঁ'র বাড়ীর চা খাওয়ার অভ্যাসটী অনেকের ভিতর ঢুকাইয়া দিয়াছিলেন।

মঠেতে অন্ন বস্ত্রের কোনও বন্দোবস্ত ছিল না। সকলেই বয়সে যুবা এবং জলন্ত তীব্র বৈরাগ্যে আত্মদেহ বিসর্জ্জন করি-য়াছে; কিন্তু স্বাভাবিক ক্ষুধা বলে একটা জিনিষ আছে'ত? ভাত জুটুক আর না জুটুক চা খাওয়াটা খুব ছিল। গুঁড়ো চা কতকটা থাক্‌তো। আর ফৌজদারী বালাখানায় পাওয়া যেতো তলায় খুরো দেওয়া গোল চীনে মাটির বাটী, হাতল নাই—যে গুলো গরীব মুসলমানরা ব্যবহার করিয়া থাকে, সেই হ'ল চায়ের বাটী। আর একটা চীনা মাটীর চামচা বা কুশী মতন একটা ছিল। সকালবেলা অনেক চা সিদ্ধ হ'ত। যার যতটা ইচ্ছা সেই দুধ চিনি বিহীন চাটা খেতো। তবে সকলে খেতো না। তারকদা মাঝে মাঝে খেতেন। এই চা খাওয়া উপলক্ষে অনেকে এক সঙ্গে ঘিরে বস্‌ত এবং নরেন্দ্রনাথ উপস্থিত থাকিলে তিনি নিজে বা অপর যে কেহ হো'ক না কেন একটা কথা তুল্‌তেন। আর সকলেই সে বিষয়ে যোগ দিয়ে নানা

আলোচনা করিত। কথাটা সামান্য হইতে ক্রমে গভীরের দিকে যাইত। কখনও কখনও এমন হয়েছে যে, একটা কথা মীমাংসা হ'তে দু' তিন দিন লেগেছিল। চা খাওয়াটাকে একটা উপলক্ষ করিয়া এইরূপ নানা কথাবার্ত্তা হইত।

একদিন আমি রাত্রে ছিলুম। সকালবেলা বড় ঘরটীতে চায়ের মজলিস বসিল। নরেন্দ্রনাথ মাঝখানে বসিলেন। নিরঞ্জন মহারাজ বাগানের দিকে জানালাতে বসিলেন। গুপ্ত মহারাজ চা এনে দিলেন। তুলসী মহারাজও এদিক ওদিক কি করিতেছিলেন। তারকদা ও বাবুরাম মহারাজ ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণটাতে বসেছিলেন। বাবুরাম মহারাজ হাঁটু দুটো উঁচু ক'রে তাইতে হাত জড়িয়ে মাথাটা একটা হাঁটুতে দিয়ে স্থির হ'য়ে কি ভাব্‌ছিলেন। তারকদা বল্লেন, "শনিচার কথাটা কি থেকে হ'ল? বোধ হ'চ্চে শনিশ্চর থেকে হয়েছে? কিন্তু এত্‌ওয়ার কথাটার কি মানে? রবিবারকে এতোয়ার কেন বলে?" তারপর কথাবার্ত্তায় ঠিক হ'ল যে, আদিত্যবার শব্দের অপভ্রংশ হচ্চে এত্‌ওয়ার। তারপর তারকদা নরেন্দ্রনাথের পাশে এসে বস্‌লেন। বল্লেন, "আমাকে চা দাও।" মনটায় বড় আনন্দ। খুব প্রফুল্ল মুখ। কয়েকমাস পূর্ব্বে গয়া থেকে এসেছেন। বলতে লাগলেন, "ওহে! জল দিয়ে'ত তর্পণ করা যায়, এবার আমি চা দিয়ে তর্পণ ক'রব।" মন্ত্র স্নুরু কর্‌লেন, "অনেন চায়েন।" জনৈক বলে ফেল্‌লেন, "অনয়া চায়য়া হবে, কেননা

চা শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ।" তারকদা হাঁস্তে হাঁস্তে বল্লেন, "তাইতো বটে, তাইতো বটে, ঠিকই বলেছ!" তারপর নানা বিষয়ে কথা সুরু হ'ল। নরেন্দ্রনাথ কথা বলিতে লাগিলেন এবং সকলেই তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। অনেকক্ষণ ধ'রে নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা চ'ল্‌লো। তারকদার কি সরল আনন্দপূর্ণ ভাব!

তামাক খাওয়া—

বরানগর মঠে তামাক খাওয়াটা খুব চলিত ছিল; কারণ সব সময়ে একটা উচ্চ অঙ্গের চর্চ্চা চলিতেছে, আর মাঝে মাঝে একবার ক'রে তামকটা টেনে নিচ্চে। ভাঁড়ারে চাল থাক্‌ আর না থাক্‌ তামাক টিকে মজুত থাকলেই সব হ'ল। প্রথম যখন মুষ্টি ভিক্ষা সুরু হয়েছিল তখন একদিন ঝিম্‌ ঝিমে বৃষ্টি পড়্‌তে লাগ্‌ল। কেউ আর ভিক্ষা কর্‌তে বেরুতে রাজী হ'ল না। সকলেই স্থির কর্‌ল যে, "আজ ভিক্ষা কর্‌তে বেরুবার আবশ্যক নাই, সকলে মিলে ভজন গাই চল!" বাস্‌, ভজন গান গাইতে সুরু করে দিলে! আর মাঝে মাঝে তামাক টান্‌তে লাগ্‌ল। সকলে এক মনে এক প্রাণে ভজন গাইতে লাগ্‌ল। সে দিন খাওয়ার চেয়ে উপবাসেতে বেশী আনন্দ হ'য়েছিল।

নূতন ভাষা তৈয়ারী করা—

নরেন্দ্রনাথ দিন কতক মাইকেলের "মেঘনাদবধ" কাব্যের উপর

ঢের কথাবার্ত্তা কইতে লাগ্‌লেন। ছন্দ, যতি, ভাষা, শব্দ ইত্যাদির উপর অনেক কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। কথাটা দু'তিন দিন খুব জোরে চলেছিল। তারপর নরেন্দ্রনাথ কোথাও বাহিরে চলে গেলেন।

গরমীকাল রবিবার সকালে আমি মঠে গেলুম। বড় ঘরের মেঝেতে একটা মাদুর পেতে উত্তরদিকে সান্ন্যাল মশায় বসে আছেন। তারকদা'র ভারি আহ্লাদ। তিনি পায়চারী কর্‌ছেন আর ডান হাতের তর্জ্জনী নেড়ে নেড়ে মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কথা কইছেন; কথাটা সুরু হল—"দেখ! বাঙ্গালা ভাষাটা বড় জবড়-জঙ্গী। এতে একটা সর্ব্বনাম এবং দুই তিন্‌টে শব্দ দিয়ে ক্রিয়াপদ হয়—Noun আলাদা আর Verb আলাদা। কিন্তু ত'া কর্‌লে হবে না, Noun টাকেই Verb করতে হ'বে, নইলে ভাষার জোর থাকে না। কি রকম জান? আলুর দম কর—এ কথা বলা চল্‌বে না। আলুটা দমিয়ে দাও—এই রকম বল্‌তে হবে।" সান্ন্যাল মশায় ফস্ ক'রে বলে উঠ্‌লেন, "লুচির বেলায় কি হ'বে?" তারকদা বল্‌লেন, "কেন? লুচিটা লুচ্চাইয়ে দাও"—বলেই বল্লেন, "আরে ছ্যা! এটা বড় বেফাঁস্ হয়, এটা চল্‌বে না। তবে কি জান? তামাকটা তাম্‌কাইয়ে দাও—এটা ঠিক হয়।" এই বলেই, ডান পায়ের হাঁটুটা উঁচু ক'রে তুলে, অর্দ্ধেক নৃত্যের মতন ক'রে, ডান হাত তুলে, ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লেন আর মুখে বল্‌তে লাগ্‌লেন "গুপ্ত, তামাকটা তাম্‌কাইয়ে দে! তামাকটা

তাম্‌কাইয়ে দে! তামাকটা তাম্‌কাইয়ে দে!" এই সামান্য উপাখ্যান থেকে তারকদা যে কি আনন্দময় পুরুষ ছিলেন, অভিমান শূন্য সরল বালকের ন্যায় তাঁর প্রাণটা কিরূপ আনন্দে পূর্ণ ছিল বেশ বুঝা যায়। বিষাদ বা বিষণ্ণ ভাব, কি ছোট বড় জ্ঞান—এ সব তাঁ'র মনে কিছুই ছিল না। He offered no prayer, he sought no praise. কাহারও কাছে গিয়ে তিনি খোসামোদও করিতেন না, এবং কাহারও কাছ থেকে তিনি প্রশংসার প্রার্থীও হ'তেন না।

নরেন্দ্রনাথের ঠাকুর পূজা—

তারকদা একদিন বলেছিলেন, "বরানগর মঠের দ্বিতীয় বা তৃতীয় বৎসর ঠাকুরের জন্মতিথি এলো, তখন প্রকাশ্য কিছুই হ'ত না। নাম মাত্র বিশেষভাবে পূজা করা হ'ত। নরেন্দ্রনাথ শশী মহারাজকে বল্‌লেন, "শশী, আজ আমি পূজা কর্‌ব।" শশী মহারাজের খুব আহ্লাদ হ'ল। তিনি পুষ্পপাত্রে ফুল চন্দন খুব সাজিয়ে দিলেন। নরেন্দ্রনাথ আসনে বসিয়া শশী মহারাজকে বলিলেন, "দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে এখন বাহিরে যা।" নরেন্দ্রনাথ আসনে বসিয়া একেবারে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। শশী মহারাজ মাঝে মাঝে দরজার ফাটাল দিয়ে উঁকি মেরে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। দেখ্‌লেন যে নরেন্দ্রনাথ আসনে বসে নিস্পন্দ হ'য়ে ধ্যান কর্‌ছেন। এই-

রূপ ঘণ্টা দেড়েকের পর নরেন্দ্রনাথের মন নীচে নামিল। তখন তিনি ঠাকুরকে ভূমিতে প্রণাম করিলেন এবং উঠিবার প্রয়াস করিতেছেন, এমন সময় মনে পড়্‌ল যে, পুষ্পপাত্রে ফুল চন্দন সব রয়েছে। নরেন্দ্রনাথ ফুল চন্দন সব এক সঙ্গে করে ঠাকুরের চিত্রের উপর অর্পণ করিলেন এবং পুষ্পপাত্র খালি করে দিলেন। তারপর তিনি বিভোর অবস্থাতে বাহিরে চলে এলেন। এই কথা আমি তারকদার কাছে শুনিয়াছিলাম। এইরূপ পূজার প্রথা নরেন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু অপরের ইহা অনুকরণ করিতে যাওয়া উচিত নয়। নরেন্দ্রনাথ মহা শক্তি-মান পুরুষ ছিলেন। তিনি বিধি নিয়মের অতীত; কারণ তিনি বিধি নিয়মের স্রষ্টা! অপরের বিধি নিয়ম পালন করিয়া চলা আবশ্যক। এ স্থলে অনুকরণ করিতে যাওয়া মহা ভুল হইবে।

বলরাম বাবুকে সেবা করা—

প্রথম বৎসর যখন ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়, সম্ভবতঃ ইংরাজী ১৮৮৯ বা ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ গরমীকাল, বলরাম বাবুর ইনফ্লুয়েঞ্জা হইয়া নিউমোনিয়া হইল। বলরাম বাবুর বাড়ীর বড় ঘরটীতে পূর্ব্বদিকের দেওয়ালের কাছে তাঁর বিছানা করে দেওয়া হ'ল। বাইরের বারান্দার পূর্ব্বদিকে হইতে দ্বিতীয় দরজার নিকটে যে স্থানটা পড়ে সেই স্থানটায়। এই সময় তারকদা, গুপ্ত

মহারাজ, নিরঞ্জন মহারাজ ও শরৎ মহারাজ প্রভৃতি বলরাম বাবুর দিনরাত সেবা করেছিলেন এবং ইহঁাদেরই কাছে—হাতের উপর শরীর রাখিয়া তাঁহার প্রাণবায়ু নিঃশেষিত হয়। তারকদা ও অপর কয়জন প্রাণ দিয়া বলরাম বাবুর অন্তিম অবস্থায় সেবা করেছিলেন। পরস্পরের প্রতি কি ভালবাসা, কি টান তাহা ইহাতেই স্পষ্ট প্রকাশ পায়। ছোট বড়, গৃহী ত্যাগী এসব কোন ভাবই তখন ছিল না। সকলেই যেন পরস্পরের নিতান্ত আপনার লোক।

Light of Asia

এই সময়ে "Light of Asia" (Sir Edwin Arnold প্রণীত) নামক একটী গ্রন্থ বাজারে উঠিল। গিরীশবাবু সেই বই-খানিকে অবলম্বন করিয়া এবং স্বচক্ষে কোন মুমুক্ষ সত্যলাভেচ্ছু সংসারত্যাগী সাধককে দেখিয়া তাঁহার "বুদ্ধদেব চরিত" খানি রচনা করেন। শরৎ মহারাজের কাছে শুনিয়াছি, পরমহংস মশায়ের কোন বিশিষ্ট ভক্তের অনুরোধই গিরীশবাবুর এই বই লিখিবার আদি কারণ। এর পূর্ব্বে বৌদ্ধ গ্রন্থ দু'একটা পণ্ডিত ছাড়া অপর কেহ পড়েন নাই। তারকদা'র "Light of Asia" খানা খুব ভাল লেগেছিল। তিনি এই বইখানা কয়েকবার পড়ে-ছিলেন। শেষকালেও, কোন বৌদ্ধ ধর্ম্মের কথাবার্ত্তা উঠিলে নি বলিতেন, "Light of Asia খানা প'ড়।" এ স্থলে

এ কথা বলা আবশ্যক যে, বৌদ্ধ ভাবের সহিত তারকদা'র ভাবের খুব সামঞ্জস্য ছিল। একথা পূর্ব্বেও বলা হয়েছে। তিনি যে কঠোর সাধন করেছিলেন তা' বৌদ্ধ গ্রন্থ পড়ে ততটা না হো'ক—সেটা তাঁর স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক প্রবৃত্তি অনুযায়ী। যদিও স্পষ্ট করিয়া তিনি বলেন নাই, কিন্তু নিবিষ্ট চিত্ত হইয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলে তাঁহার ভিতর বুদ্ধের অনেক ভাব পরিলক্ষিত হইত। এ স্থলে বৌদ্ধ ধর্ম্মের কথা হইতেছে না, কিন্তু বুদ্ধের বৈরাগ্য, কঠোর তপস্যা, উদার ভাব ও সর্ব্বজীবে ভালবাসা ইত্যাদি ভাব বেশ তাঁ'র ভিতর দেখিতে পাওয়া যাইত।

বৌদ্ধভাব—

বেলুড়মঠে কথা প্রসঙ্গে একদিন বিকাল বেলা কথা উঠিল যে, জপ করাই হ'চ্চে শ্রেষ্ঠ জিনিষ, জপের ভিতরেই সব রকম জিনিষ পাওয়া যায়। জপের নানা রকম অবস্থার কথা হইতে লাগিল। তারকদা বলিলেন, "না হে! আমার জপটা তত ভাল লাগে না, ধ্যানটা ভাল লাগে।" আমি বল্‌লুম, "তারকদা, কি রকম ধ্যান করো?" ধ্যান বহু প্রকার আছে জানিয়া এই কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তারকদা বল্লেন, "আমি কি রকম ধ্যান করি জান? মহাব্যোম বা মহাশূন্যের ভিতর আমি স্থির হ'য়ে বসে আছি, সত্ত্বা মাত্র আছে—দ্রষ্টা বা সাক্ষীরূপে থাকি। এমন কি কোনও চিন্তাই উঠিতে দিই না। একভাবে স্থির,

নিশ্চল, নিস্পন্দ হ'য়ে, সত্তামাত্র অবলম্বন করে বসে থাকি। আমার এই ধ্যানটা ভাল লাগে।" আমি বল্লুম, "তারকদা এ যে বৌদ্ধ শূন্যবাদীদের মত ?" তারকদা বল্লেন, "তা কে জানে বাপু ! হয়'ত আর জন্মে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ছিলুম, এ জন্মে বামুনের ঘরে জন্মেছি ! দেখ, আমার পৈতার পর আমি দিনকতক নারায়ণ পূজা করেছিলুম ও ভোগ দিয়েছিলুম। সেটা কর্‌তে হয় তাই করেছিলুম, কিন্তু আমার পূজা পাঠ ঘণ্টা নাড়া তত ভাল লাগেনা। মহাব্যোমে চুপ করে বসে ধ্যান কর্‌বো—এইটী হ'চ্চে আমার ভিতরকার ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি। আর যা' করি তা কর্‌তে হয় বলে ক'রে থাকি। বামুনের ঘরে জন্মেছি ত ? পূজা পাঠ একটু আধটু শিখেছিলুম !" আমি বল্‌-লুম, "তারকদা, তুমি আগে যে রকম চল্‌তে—ডান পায়ের বুড়ো আঙ্গুল থেকে কিঞ্চিৎ দূরে দৃষ্টি রেখে, এটা হচ্চে বৌদ্ধ প্রথা।" তারকদা বল্‌লেন, "তা' হবে, আমি অত বুঝে সুজে কিছু করিনি।"

এই সকল ভাব পর্য্যালোচনা কর্‌লে বেশ বুঝা যায় যে, শিবানন্দ স্বামীর ভিতর বুদ্ধের অনেক ভাব প্রচ্ছন্ন ছিল এবং বৌদ্ধ ভাবের সহিত অনেক বিষয় তাঁ'র মিল ছিল। তবে যে অপর ভাব—ভক্তির বা কর্ম্মের ভাব ইত্যাদি ছিল না, এ কথা বলিবার নয়। অল্প বিস্তর সব ভাবই তাঁহার ভিতর ছিল। সময়ে সময়ে তাঁহার ভিতর এক একটী ভাবের প্রাধান্য আসিত ;

কিন্তু তাঁহার ভিতর বুদ্ধের নির্গুণ ভাবটাই বিশেষ প্রীতিকর ছিল বোঝা আবশ্যক। যাঁহারা প্রাচীন চিত্রে বৌদ্ধ অরহতের প্রতিকৃতি দর্শন করিয়াছেন, মহাপুরুষ শিবানন্দের সাধন অবস্থার প্রতিকৃতি দর্শন করিলে, উভয়ের মধ্যে বহু বিষয় সৌসাদৃশ্য আছে এটা বেশ স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারিবেন। তিনি পূর্ব্বজন্মে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ছিলেন কিনা সে কথা আমি কিছু বলিতে পারিনা। মোট কথা এই যে, তিনি উচ্চ মার্গের ধ্যানী ছিলেন এবং গভীর ধ্যানে নিমগ্ন থাকাই তাঁহার যেন স্বভাবসিদ্ধ ভাব ছিল। এই ধ্যানের শক্তি বলে তিনি দেহ হইতে বিদেহ হইয়া থাকিতেন। দেহের ভিতর থাকিতেন, কিন্তু দেহের সহিত বিশেষ সম্পর্ক থাকিত না। He was in the flesh but not of the flesh".

ভূমির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলা—

তারকদা ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলী হইতে অল্প দূরে দৃষ্টি রাখিয়া চলিতেন। এ বিষয় বৌদ্ধমতের কথাও উল্লেখ করা হইয়াছে। যদি কেহ এই বিষয়ের স্বার্থকতা—এইরূপ ভূমির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলার উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারেন, সেইজন্য বিশদভাবে এ বিষয়ের কিছু বর্ণনা করিতেছি। ধ্যান করিবার সময় ত্রাটক বা একদৃষ্টি (Fixating of the eyes) বলিয়া একটা প্রথা আছে। এই ত্রাটক বা Fixating of Eyes করিলে মনটা

স্বভাবতঃই স্থির হইয়া যায়। এক প্রকার ত্রাটক হইতেছে—নাসিকাগ্রে দৃষ্টি। নাসিকার অগ্রদিকে দৃষ্টি রাখিলে মন স্থির হয়। এই প্রক্রিয়াতে সম্মুখের ভূমিতে প্রায় দুই হস্ত পরিমিত স্থান দৃষ্টিগোচর হয় এবং তাহার বাহিরে দৃষ্টি যায় না। দ্বিতীয় প্রকার ত্রাটক হইল—নাসিকা মূলে। তৃতীয় হইল—ভ্রূমধ্যে। এই তিন প্রকার দৃষ্টিকেই 'দেবনেত্র' কহিয়া থাকে। ইহাতে উচ্চ অঙ্গের ধ্যান হইয়া থাকে। চলিত ভাষায়, ইহা হইতেছে 'পদ্ম-নেত্র' 'শঙ্খ-নেত্র' ও 'মীন-নেত্র'। 'পদ্ম-নেত্র' হইতেছে পদ্মের পাপড়ীর (petals) ন্যায়। 'শঙ্খ-নেত্র' হইতেছে লম্বাদিকে চেরা শঙ্খের এক অংশের ন্যায়। 'মীন-নেত্র' বা 'মীনাক্ষী'—দুইটী মৎস্য যেন মুখোমুখী হইবার চেষ্টা করিতেছে। চিন্তা যা'র যেরূপ গভীর হইবে এবং ভাবরাশি যত উচ্চদিকের হইবে চক্ষের দৃষ্টিরও স্বভাবতঃই সেইরূপ পরিবর্ত্তন হইবে। এইজন্যই এই দৃষ্টির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

খৃষ্টানদিগের কথা—তারকদা'র উদারতা—

বরানগর মঠ যখন প্রথম হইয়াছে, তখন বরানগরের বাজারে Salvation Army একটী প্রচার করিবার আড্ডা করিল এবং কতকগুলি দেশী খৃষ্টান (প্রথম ইংরাজী নাম ও তা'র শেষে 'বিশ্বাস' দেওয়া—যথা, লিউক্ বিশ্বাস) বরানগর মঠে কয়েকদিন যাতায়াত করিল। তাহারা যুবা ও ষণ্ডা চেহারা।

প্রথম দু'চার দিন তাহারা ধর্ম্মবিষয়ে একটু কথাবার্ত্তা কহিল। তাহার পর, মঠের সকলকে যুবা দেখিয়া তাহারা নিজেদের মনোগত ভাব প্রকাশ করিয়া নানা প্রকার প্রলোভন দেখাইতে লাগিল। তাহারা স্পষ্টাস্পষ্টি বলিল, "আপনারা জোয়ান, একা থাকেন কেন? বিলাতী মেম সব বে দিয়ে দেবো, চলুন আমাদের সঙ্গে; খৃষ্টান হবেন, বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে থাক্‌বেন!" শশী মহারাজ এই কথা শুনে একেবারে রেগে উঠ্‌লেন এবং তা'দের গালমন্দ দিয়ে তাড়িয়ে দিলেন। তারকদা'ও মহা বিরক্ত হ'য়েছিলেন, কিন্তু মিষ্ট ভাষায় তাহাদিগকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এই ব্যাপারে শশী মহারাজের রাগটা কয়েকদিন পর্য্যন্ত ছিল। এই ঘটনার দু' একদিন পরে আমি মঠে গিয়ে এবিষয় শুনলুম।

আর একটী বৃদ্ধ খৃষ্টান ছিলেন। তাঁ'র সহিত তারকদা'র বেশ সৌহার্দ্দ হ'য়েছিল। লোকটী বুড়ো মানুষ, গেরুয়া পরিতেন, মাথায় ঝাঁক্‌ড়া ঝাঁক্‌ড়া চুল, আর কিছু লম্বা দাড়ী ছিল। লোকটী এদিকে সাধন ভজন কিছু কর্‌তেন। ভক্তিভাবও বেশ ছিল। গঙ্গাস্নান করিয়া সকলে যেমন একটা ঠাকুর দেবতার নাম করে—কালী, দুর্গা, কৃষ্ণ ইত্যাদি যে নামই হউক না কেন, এই ব্যক্তি গঙ্গাস্নান করিয়া সেইরূপ ঠাকুর দেবতার নাম কর্‌তেন। প্রথমে লোকে অত কান পাতিয়া শুনে নাই; কারণ গেরুয়াপরা লোক সাধুই হইবে বোধ হয়! তা'রপরে

যখন মন দিয়া কান পাতিয়া রহিল, তখন শুনিতে পাইল, "জয় মেরীনন্দন! জয় মেরীনন্দন! জয় মেরীনন্দন!" সাধারণ লোকে মনে করিল, 'যশোদানন্দন' এই কথাটা বৃদ্ধের মুখে ঠিক উচ্চারণ হইতেছে না; সেইজন্য বৃদ্ধ কথাটা অপভ্রংশ ক'রে উচ্চারণ করিতেছেন। ক্রমে ক্রমে যখন শুনিল যে, লোকটী খৃষ্টান, আর 'মেরীনন্দন' মানে 'যীশুখৃষ্ট', তখন সকলে গঙ্গাস্নান ক'রে একটু দূরে থাক্‌ত। কেউ তাঁকে ছুঁতো না। এই বৃদ্ধটী পরে Salvation Army'র সহিত মিশিয়াছিলেন। ভাবের উচ্ছ্বাস হইলেই তিনি দাঁড়িয়ে নৃত্য কর্‌তেন। এইজন্য তাঁ'র নাম হয়েছিল 'Sen the Jumper.' তারকদা'র এমন উদার ভাব ছিল যে, এই ব্যক্তি একটু সাধন ভজন করিতেন বলিয়া এই লোকটী বরানগর মঠে যাইলেই তারকদা বেশ আদর ক'রে তাঁহার সহিত সাধন ভজনের কথা কইতেন। তাঁহার সহিত কোন সঙ্কোচ ভাব রাখিতেন না। এমন কি কখনও কখনও বলিতেন, "কেন অমন ক'রে ঘুরে মর্‌ছ? তুমি সন্ন্যাস নিয়ে এখানে পড়ে থাক। সাধন ভজন কর, তা হ'লে তোমার কিছু হ'তে পারে।" এইটা হচ্চে তারকদা'র উদার ভাবের একটা নিদর্শন। তাঁ'র কাছে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান বলে বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না ও সেজন্য তিনি কাহাকেও অবজ্ঞা করিতেন না। তিনি সকলের চেয়ে বেশী উদার ভাবের লোক ছিলেন।

৺কাশী যাওয়া—

তারকদা চাকরী ছেড়ে দিয়ে কর্ম্মসঞ্চিত বিত্ত (Provident Fund) থেকে শ' পাঁচেক (৫০০৲) টাকা পেয়েছিলেন। সেইটা বলরাম বাবুর বা আর কা'র কাছে জমা ছিল ঠিক্ মনে নাই। যতদূর জানা আছে, মাঝে মাঝে সেই টাকা নিয়ে তিনি ঘোরাঘুরি কর্তেন। তারকদা'র তখন বড় ঘোরা অভ্যাস ছিল। বরানগর মঠে অল্প দিন থাকিয়াই তিনি সেই টাকা থেকে কিছু নিয়ে কাশী গেলেন। কাশীতে তিনি অনেক সময় প্রমদানাথ মিত্রের বাড়ী থাকিতেন। কিছু দিন পরে, নরেন্দ্রনাথ এলাহাবাদে যাইলেন এবং সেখানে কয়জন মিলিয়া ডাঃ গোবিন্দ চন্দ্র বসুর বাড়ীতে ছিলেন। এই সময় যোগেন মহারাজের অসুখ করেছিল। সেই উপলক্ষে কালী বেদান্তীও উপস্থিত হইল অর্থাৎ ৫।৬ জন লোক একত্রিত হইল। গোবিন্দ ডাক্তারের বাড়ীতে কিছু দিন থাকিয়া নরেন্দ্রনাথ ও তারকদা ঝুসীতে তপস্যা করিতে গেলেন।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে, গোবিন্দ ডাক্তার আমার সহিত সাক্ষাৎ হ'লে বলেছিলেন, "এই দু'টী যুবক জ্বলন্ত পাবকের ন্যায়—যেমন জ্ঞান, তেমনি ধ্যান, তেমনি বৈরাগ্য ! দু'জনে গিয়ে ঝুসীতে তপস্যা কর্তে লাগ্‌লেন। শুধু পা, আর গায়ে একখানা ঘোড়ার কম্বল। তাঁ'রা কঠোর তপস্যা সুরু কর্‌লেন। আমি এক এক দিন গিয়ে দেখে আস্‌তুম। আমার লজ্জায় ও ক্ষোভে বুক

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, পাচক ব্রাহ্মণ, শ্রীযুত মহেন্দ্র নাথ গুপ্ত, স্বামী শিবানন্দ,
স্বামী বিবেকানন্দ, দেবেন্দ্র নাথ, স্বামী ত্রিগুণাতীত, হরিশচন্দ্র মুস্তফী,
স্বামী নিরঞ্জনানন্দ [illegible]

ফেটে যে'ত! আমি জুতো মোজা পায়ে দিয়ে, গায়ে জামা ও আলোয়ান দিয়ে দু'জনকে দেখ্‌তে যেতুম্; কিন্তু এই দুইটী দেবপ্রতিম যুবক শুধু পায়ে, একটা ঘোড়ার কম্বল গায়ে দিয়ে, মেঝেতে পড়ে আছেন! পায়ের গোড়ালী ফেটে গেছে! আমি সন্ধ্যার আগে বাড়ীতে ফিরে আস্‌তুম, কিন্তু আমার প্রাণটা সেখানে পড়ে থাক্‌ত; এমন কি আমার এক এক সময় ইচ্ছা হ'ত যে আমি এঁদের মত সন্ন্যাস নিয়ে তপস্যা করি! আবার ঘর সংসারের কথা ভাব্‌লে সে ভাব আবার সব নিভে যে'ত। এঁরা যে দয়া করে অল্পদিন আমার বাড়ীতে ছিলেন এইটীই আমার পরমসৌভাগ্য। ইহাতে আমার চিরকাল একটা আনন্দের স্মৃতি রয়েছে। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে, তারকদা এলাহাবাদে যান এবং গোবিন্দ ডাক্তারের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় উভয়ে পরম আনন্দিত হন। পূর্ব্বকথা উঠাতে তারকদা বল্লেন, "তখন স্বামীজি ও আমি দু'জনে ঝুসীতে প'ড়ে থাকতুম। কি দিন, কি রাত্তির, একভাবে ধ্যানে কাটত! সকালবেলা একবার ছত্রে গিয়ে খানকতক রুটী আর একটু ডাল আন্‌তুম, কিন্তু তা'দিয়ে খাওয়া চলে না। গোবিন্দ ডাক্তার মাঝে মাঝে একটু আনাজ তরকারী দিয়ে আস্‌ত। সেই আনাজ তরকারী রেঁধে মাঝে মাঝে একটু মুখ বদ্‌লাতুম। এইরূপে ঝুসীতে কিছুদিন পড়েছিলুম।" ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে, "উদ্বোধন" মাসিক পত্রে ডাক্তার গোবিন্দচন্দ্র বসুর নাম দিয়ে একটু উপাখ্যান প্রকাশ

করা হ'য়েছিল। গোবিন্দ ডাক্তার আমায় যা বলেছিলেন তাই লিখে পাঠিয়েছিলুম।

গাজীপুরের কথা—

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে, গোবিন্দ ডাক্তারের সহিত এলাহাবাদ দেখা হওয়ায় তিনি বলিলেন, "স্বামীজি এলাহাবাদে কিছুদিন থেকে গাজীপুরে চলে গেলেন। গাজীপুর থেকে আমায় একখানি চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠিখানি আমি চিরকাল যত্ন সহকারে রেখেছিলুম, কিন্তু সম্প্রতি সেই চিঠিখানি নষ্ট হ'য়ে গে'ছে। আর পাওয়া যাচ্চে না। যাহা হো'ক চিঠিতে এই লেখা ছিল—গোবিন্দ, আমি গাজীপুরে এসেছি। পাহাড়ী বাবার সহিত সাক্ষাৎ করিব। সেখানে কিছু উচ্চতর বস্তু পাইতে ইচ্ছা করি; কারণ সকলেই তাঁহাকে উচ্চ অবস্থার লোক বলিয়া সম্মান করেন। তা আমি একবার চেষ্টা ক'রে দেখ্‌ব যদি কিছু পাই।" এই সময়ে তারকদাও নরেন্দ্রনাথের সহিত ছিলেন। পাহাড়ী বাবার সহিত নরেন্দ্রনাথের দু' তিন দিন দেখা হ'য়েছিল। দরজার ভিতর চিঠি ফেল্‌বার মতন যে একটা গর্ত্ত ছিল, পাহাড়ী বাবা ভিতর দিক্ থেকে সেই গর্ত্তের কাছে আসিতেন এবং গর্ত্তের ভিতর দিয়া আগন্তুককে দেখিতেন ও কথাবার্ত্তা কহিতেন। এই সকল বিষয় অন্যান্য গ্রন্থে থাকায় এস্থলে ইহার বিশেষ বিবরণ পরি-

ত্যাগ করিলাম। যাহা হউক, তারকদা পাহাড়ী বাবার আশ্রমে সে সময়ে গিয়াছিলেন। গাজীপুরে তিনি শ্রীযুত গগন চন্দ্র রায়ের বাড়ীতে বা সেখানকার মুন্সেফ্ শ্রীযুক্ত শ্রীশ চন্দ্র বসুর (যিনি পরে এলাহাবাদের ডিষ্ট্রিক্ট জজ্ হয়েছিলেন) বাড়ীতেও থাকিতেন।

১৮৯৩ বা ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে, যখন আমি লক্ষ্ণৌ যাই, গুটি-কতক বাঙ্গালী ভদ্রলোক সন্ধ্যার সময় আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসেন। পাঁচ ছয়টী লোক; বেশ সৎ লোক। তাঁ'রা সকলেই একবাক্যে বলিলেন, "গুটিকতক বাঙ্গালী সন্ন্যাসী (হরি মহারাজ, রাখাল মহারাজ ও মহাপুরুষ মহারাজ) কয়েক বৎসর আগে এখানে এসেছিলেন। লোকগুলি যথার্থই সাধু বটে! খুব ধ্যানী, ত্যাগী ও অতি মিষ্টভাষী। লোকগুলিকে দেখিলেই স্বভাবতঃ শ্রদ্ধা, ভক্তি আসে। তাঁহাদের ভিতর একটী লোকের নাম শিবানন্দ। তিনি খুব উন্নত অবস্থার দেখিলাম। সর্ব্বদাই বিভোর ও তন্ময় হইয়া রহিয়াছেন। কথাগুলি অতি মিষ্ট ও শান্ত। তাঁর সঙ্গের কয়েকটী সাধু সকলেই বলিলেন যে, ইনি খুব উচ্চ অবস্থার লোক। আর তাঁহাকে দেখিয়া আমাদেরও সেইরূপই ধারণা হইল। বিশেষ করে এইটী দেখিলাম যে, অন্যত্র যাইবার সময় আমরা সকলে যখন বলিলাম— "স্বামীজি, আপনাদের রেলের টিকিট্ আমরা কিনে দি?" তখন তাঁহারা অতি সরল ও বিনীতভাবে বলিলেন যে,

রেলের টিকিটের দাম দিবার কোন আবশ্যক নাই, তাঁহাদের কাছে টিকিটের ভাড়ার মতন অর্থ আছে। এইজন্য তাঁহারা কিছুতেই ভাড়া লইলেন না। এইরূপ ত্যাগী সাধু খুব কম দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁরা যে কয়দিন এখানে ছিলেন আমাদের সকলের বড় আনন্দ হ'য়েছিল।" এইরূপে তাঁ'রা সকলেই শিবানন্দ প্রভৃতির বিশেষ সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন।

হরিদ্বার ও বদ্রীনারায়ণে—

শিবানন্দ স্বামী, তপস্যার কালে পরিব্রাজক অবস্থায়, কয়বার হরিদ্বারে গিয়াছিলেন তাহা ঠিক স্মরণ নাই; তবে এই পর্য্যন্ত জানি যে তখন সাহারাণপুর পর্য্যন্ত রেল খুলিয়াছিল, আর বাকি স্থানটা হেঁটে যেতে হ'ত। তখনকার দিনে কনখল, হরিদ্বার প্রভৃতি স্থান অতি ভীষণ ও দুর্গম ছিল। বাড়ী, ঘর, দুয়ার, বাঁধান রাস্তা ঘাট প্রভৃতি কিছুই ছিল না। সত্যনারায়ণের মন্দির তখন একটা চড়ায় ছিল। সেটা এখন ভেসে গেছে। এখনকার যে চলিত রাস্তা বা পুল এ সব তখন কিছুই হয় নি। গঙ্গার কিনারা দিয়ে যেতে হ'ত। বুনো হাতী ও বাঘের বড় উৎপাত ছিল। সে একটা ভীষণ জঙ্গল ছিল! যাহা হউক, শিবানন্দ স্বামী একা বা অন্য লোকের সহিত এই সময় হরিদ্বার গিয়েছিলেন, সেটা আমার ঠিক স্মরণ নেই। তিনি ধীরে ধীরে বদ্রীনারায়ণে যান। গঙ্গাধর মহারাজ কয়েক বৎসর পূর্ব্ব

হইতেই তিব্বত গিয়াছিলেন। তাঁহার কোন খবর ছিল না। কেউ কিছুই নির্ণয় করিতে পারিতেছিলেন না যে, তিনি কোথায় আছেন। শিবানন্দ স্বামী বদ্রীনারায়ণে গিয়া গঙ্গাধর মহারাজকে দেখিতে পান। এইরূপে কয়েক বৎসর পর গঙ্গাধর মহারাজের সংবাদ পাওয়া যায়। গঙ্গাধর মহারাজকে নীচুতে নেমে আসার কথা বলায় তিনি অসম্মতি প্রকাশ করেন এবং পুনরায় তিব্বতে ফিরিয়া যান।

আলমোরা হইতে বরানগর মঠে—

শিবানন্দ স্বামী আলমোরায় যাইয়া বদ্রীদাস থুলঘোড়িয়ার বাড়ীতে থাকিতেন। ঠিক্ কোন সময়ে তিনি এখানে গিয়াছিলেন তাহা আমার স্মরণ নাই। এইরূপে তিনি হিমালয়ের কয়টী স্থানে ভ্রমণ ও বাস করেছিলেন। এই সময় তারকদার মন বড়ই অস্থির ছিল; কারণ সর্ব্বদাই দেখা যাইত যে তিনি একস্থানে অনেক দিন থাকিতে পারিতেন না। কখনও বা বরানগর মঠে থাকিতেন, কখনও বা পশ্চিমে চলিয়া যাইতেন; তাঁহার মনে একটা চাঞ্চল্যের ভাব ছিল। এই পরিব্রাজকের অবস্থার কথা আমার কিছু স্মরণ নাই; এইজন্য এ বিষয়ে পর্য্যায়ক্রমে কিছু বলিতে পারিলাম না। যাহা হউক, কিছুদিন বাহিরে থাকিয়া তারকদা আবার বরানগর মঠে আসিলেন। তখনকার উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছু ঘটনা আমার স্মরণ নাই,

তবে এই সময় তিনি খুব ধ্যানী ছিলেন এবং কঠোর তপস্যা করিতেন। তাঁ'র একটী বিশেষত্ব দেখিতাম যে, সিমলা আসিলেই তিনি আমার খবরাখবর লইতেন ও দেখা করিয়া যাইতেন। এটা তাঁ'র স্নেহ ও ভালবাসার একটী নিদর্শন। সেই ডোরা-কাটা কম্বলখানি গায়ে দিয়ে তিনি সব খবর নিয়ে চলে যেতেন।

ফাল্গুন মাসে ঠাকুরের উৎসব। তখন উৎসব হইত দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দিরে। বরানগর মঠে সকালবেলা আমি তারকদাকে বল্‌ছিলুম যে গঙ্গাধর মহারাজ বলেছিলেন যে, তিব্বতে মাখম দিয়ে চা খায়। এইরূপ সামান্যভাবেরই কথা হইতেছিল। তারকদা মহা আনন্দে বল্লেন, "ঠিক বলে'ছ, একবার করে দেখ্‌লে হয়!" এই বলে ঠাকুর ঘরে গিয়ে সকালবেলার প্রসাদী মাখম নিয়ে এলেন। তারপর উনুনে চা চড়ালেন; চা'র বাটীতে খানিকটা মাখম দিয়ে আমাকে বল্‌লেন, "ঢালা ওগড়া করে খাও দিকিনি। গঙ্গাধর'ত তিব্বতের গল্প বলে থাকে। আমরা এখানে বসে তিব্বত কর্‌ব!" এই বলে হাঁস্‌তে হাঁস্‌তে মাখম দেওয়া চাটা ঢালা ওগড়া করে আমাকে খাওয়ালেন। মাখম দেওয়া চা অনেক পরিমাণে খাওয়ায় সারাদিন আমার গাটা জ্বলে ছিল। এই সামান্য ভাব দিয়েই তারকদা'র সরল ও বালক ভাব প্রকাশ পায়। এই সকল গুণ ভিতরে থাকায় ভবিষ্যতে তিনি এত লোকরঞ্জন হ'য়েছিলেন এবং তাঁর এত অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি

বেড়েছিল। এই সকল হইতেছে বিশিষ্ট লোকের মনোবৃত্তির পূর্ব্বাভাস। এইজন্য এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপাখ্যানগুলি আমি সন্নিবেশিত করিলাম। মহৎ লোক, প্রসিদ্ধলোক একদিনেই তৈরী হয় না। তাঁহাদের স্বাভাবিক মনোবৃত্তি অন্যপ্রকার এবং সেই মনোবৃত্তি নানা অবস্থা ও নানা ঘটনার ভিতর দিয়ে পরিস্ফুট হ'বার চেষ্টা করে এবং যে পরিমাণে বাধা, বিঘ্ন ও অন্তরায় সম্মুখে আসে, তাঁহাদের আত্মবিজয়ী শক্তিও সেই পরিমাণে প্রবুদ্ধ ও বর্দ্ধিত হয়। অবশেষে এই শক্তি সমস্ত অন্তরায়কে পরাভূত করিয়া নিজের প্রাধান্যকে স্থাপন করে। কোনও ব্যক্তিকে বুঝিতে হইলে তাঁহার বড় কার্য্য লইয়া আলোচনা করিতে নাই; কিন্তু ক্ষুদ্র কার্য্যের দ্বারা (অতর্কিতভাবে যখন সে কার্য্য করে) তাহার অন্তর বেশ বুঝা যায়। এই সকল উপাখ্যান দিয়া আমি মহাপুরুষ শিবানন্দের মনোবৃত্তির পরিস্ফুটি (Psychological development) প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছি এবং মনোবৃত্তির ভাব কখন কিরূপ হ'য়েছিল তা'রই এক একটী প্রতিকৃতি (Photo) লিপিবদ্ধ করিতেছি। ভবিষ্যতে এই সকল উপাখ্যান সংগ্রহ মধ্যে তাঁর বিশেষ জীবনী লিখিবার উপকরণ রহিল।

বরানগর মঠের তপস্যা—

বরানগর মঠ যখন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় তখন অতিশয় কষ্টের

দিন ছিল, সকলে তীব্র বৈরাগ্য বশতঃ কাহারও কোন বস্তু গ্রহণ করিত না। সাধনা, তপস্যা একমাত্র মূল মন্ত্র ও লক্ষ্য ছিল। পাছে কোন বস্তু গ্রহণ করিলে শক্তি ক্ষয় ও তপস্যায় বিঘ্ন হয়, এইজন্য সাধ্যমত কেহ কাহারও কোন দান গ্রহণ করিত না। একদিকে আহারের কষ্ট, অপর দিকে কঠোর তপস্যা। এইরূপ তপস্যা করায় হৃদয়ে সিংহ-বিক্রম জাগ্রত হইত। চক্ষুর দৃষ্টি ও পদবিক্ষেপে বোধ হইত যেন, মেদিনীকে কম্পিত করিয়া এই কয়টী যুবক জগতে বিচরণ করিবে। তাহারা জগৎ ও জগতের ভোগ্য বস্তু বা জগতের আকর্ষণী শক্তি সমস্তকেই তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিল। কি করিলে ব্রহ্ম লাভ হয়, জীবনের প্রত্যেক ক্রিয়াতে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মশক্তি বিকাশ করা যায়—এইটাই তখন তা'দের উদ্দেশ্য ছিল। আর ভবিষ্যতে ইহাও দেখা যাইল যে, এই কয়টী যুবক গম্ভীর, নিস্তব্ধ পদ-বিক্ষেপে সমস্ত জগতকে বিক্ষোভিত ও পদদলিত করিল! বরানগর মঠে, ইঁহাদের জীবনের প্রথম অবস্থায় মনে যে উদ্দেশ্য জেগে ছিল, প্রত্যেকেই কোনও না কোন ভাবে ভবিষ্যৎ জীবনে তাহা দেখাইয়াছেন; যদিও কিঞ্চিৎ তারতম্যের কথা উঠিতে পারে, সে বিষয়ে আমি কিছু বলিতেছি না; কিন্তু সাধারণ লোক অপেক্ষা তাঁহারা যে উচ্চ মার্গের ও উচ্চ অবস্থার সাধক হয়েছিলেন এ বিষয়ে কাহারও কোন সন্দেহ নাই। সেই বরানগর মঠের শক্তি, কঠোর তপস্যা ও উদ্দেশ্য জগতের

সম্মুখে আদর্শ হইয়া রহিয়াছে। যতদিন জগতে সাধক বলিয়া এক শ্রেণীর লোক থাকিবেন ততদিনই বরানগর মঠের কঠোর তপস্যা ও সাধনার বিষয়কে আদর্শ করিয়া সকলে সাধনার পথে অগ্রসর হইবেন, এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

বরানগর মঠের সকলের তপস্যার বিষয় আলোচনা ও চিন্তা করিলে বেশ দেখিতে পাওয়া যায় যে, 'যতদূর মনটা নামাইবে, পক্ষান্তরে মনটা ততটা উচ্চে উঠিবে' এই প্রবাদটী অতীব সত্য। মনটা নামান অর্থে নিকৃষ্ট বস্তুতে নামান নয়। কিন্তু ইহাই বুঝিতে হইবে যে, মনটা দেহত্যাগ করিয়া যত গভীর স্তরে যাইবে, উহার গতি বিবর্ত্তিত হইলে পূর্ব্বের গভীর স্তরটী উচ্চস্তর বলিয়া পরিগণিত হইবে অর্থাৎ মন যখন স্থূল শরীর ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম শরীরে বাস করে এবং সূক্ষ্ম শরীর ত্যাগ করিয়া কারণ শরীরে অবস্থান করে, পরে কারণ শরীরও ত্যাগ করিয়া যেমন মহা-কারণে চলিয়া যায়, সেই রূপে গতির বিবর্ত্তন কালে সূক্ষ্মতম অবস্থাটী অতি উচ্চস্তর বলিয়া প্রতীয়মান হয়; কারণ নিয়ম হইতেছে যে, গতি কখনও সরলভাবে ঘটে না, কিন্তু ইহা চক্রাকৃতি (circle) বা বর্ত্তুলাকৃতি (Ellipse) হইয়া ঘটে। মন যখন স্থূল শরীরে থাকে তখন সেই ব্যক্তি সাধারণ ব্যক্তির মত পান, আহার ও কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকে, অপর ব্যক্তি হইতে কোন পার্থক্য বা বৈশিষ্ট্য ভাব লক্ষিত হয় না; কিন্তু মন যখন স্থূল দেহ ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম দেহে চলিয়া যায় তখন দেহের ক্রিয়া

অনেক পরিমাণে কমিয়া যায় এবং সাধারণ লোক হইতে নানারূপ বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। এইজন্য সাধারণ লোক সেই ধ্যানী ব্যক্তিকে বিপথ-মার্গী বা ভ্রান্ত-মার্গী বলিয়া বিদ্রূপ করে। ক্রমে মনটা যখন সূক্ষ্ম হইতে কারণ দেহে চলিয়া যায় তখন স্থূলের প্রক্রিয়াসকল নির্ব্বাপিত হইয়া আসে অর্থাৎ স্থূল শরীরটা অনেক পরিমাণে নিষ্ক্রিয় হইয়া যায়। সাধারণ লোক বা প্রাকৃত ব্যক্তি সেই অবস্থা বুঝিতে না পারিয়া অনেক প্রকার ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও অপ্রিয় শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকে; কারণ ধ্যানী সাধারণ পন্থা পরিত্যাগ করিয়া নবপন্থা আবিষ্কার ও উদঘাটন করিতে চেষ্টা করেন। এইজন্য প্রাকৃত ব্যক্তিরা ইহাকে বায়ু রোগ বা বিপথমার্গ বলিয়া ঘৃণা করে; এই ভাবটী জগতের সমস্ত মহাপুরুষদের জীবনীতে পরিলক্ষিত হয়। ভগবান্ বুদ্ধ যখন কঠোর তপস্যা করিতেছিলেন তখনকার বিষয় "ললিতবিস্তরঃ" গ্রন্থে এইরূপ বর্ণিত আছে :—

"ইতিহি ভিক্ষবো বোধিসত্ত্বো লোকস্যাদ্ভূতক্রিয়াসংদর্শনার্থং পূর্ব্বদত্যাবৎ কর্ম্মক্রিয়া প্রণষ্ঠানাং সত্ত্বানাম্ কর্ম্মক্রিয়াঽবতারনার্থং পুণ্যসঞ্চয়ানাং চোদ্ভাবনায় মহাজ্ঞানস্য চ গুণসংদর্শনার্থং ধ্যানাঙ্গানাঞ্চ বিভজনার্থমেকতিলকোলতণ্ডুলেন ষড়্বর্ষানি দুষ্করচর্য্যামুপদর্শয়তি স্ম॥ অদীনমানসঃ ষড়্বর্ষানি বোধিসত্ত্বো যথাঽনিষন্ন এবাস্থাৎ পর্য্যঙ্কে। ন চ ঈর্যাপথাচ্ চ্যবতে স্ম। নাতপাচ্ছায়ায়ামগমন্নচ্ছায়ায়া আতপন্ন চ বাতাতপবৃষ্টি পরিত্রাণমেকরোন্ন

চ দংশমশকসরীসৃপানপনয়তি স্ম। ন চোচ্চারপ্রশ্রাবশ্লেষ্ম-সিংঙ্ঘাণকানুৎসৃজতি স্ম। ন চ সম্যগ্ জানুপ্রসারণমকরোৎ। ন চ পার্শ্বোদরপৃষ্ঠস্থানেঽনাচ্ছাত্তেঽপি চ তে মহামেঘা দুর্দিন বর্ষাশরদ্গ্রীষ্মহৈমন্তিকা বোধিসত্ত্বস্য কায়ে নিপতন্তি স্ম॥ ন চান্যতো বোধিসত্ত্বঃ পাণিনাঽপি প্রচ্ছাদনমকরোৎ। ন চেন্দ্রিয়াণি বিপথয়তি স্ম। ন চেন্দ্রিয়ার্থান্ গৃহ্ণীতে স্ম। যে চ তত্রাগমন্ গ্রামকুমারকা বা গ্রামকুমারিকা বা গোপালকা বা পশুপালকা বা তৃণহারিকা বা কাষ্ঠহারিকা বা গোময়হারিকা বা তে বোধিসত্ত্বং পাংশুপিশাচমিতি মন্যন্তে স্ম। তেন চ ক্রীড়ন্তি স্ম। পাংশুভিশ্চৈনং ম্রক্ষয়ন্তি স্ম॥"

"তত্র বোধিসত্ত্বমাদিত এব দুষ্করচর্য্যাং চরন্তং দশগ্রামিক-দুহিতরঃ কুমার্য্য উপতস্থুর্দর্শনায় বন্দনায় পর্য্যুপাসনায় চ॥ এককোলতিলতণ্ডুলপ্রদানেন চ প্রতিপাদিতোঽভূৎ॥ বলা চ নাম দারিকা বলগুপ্তা চ প্রিয়া চ সুপ্রিয়া চ বিজয়সেনা চ অতি-মুক্তকমলা চ সুন্দরী চ কুম্ভকারী চ উলুবিল্লিকা চ জটিলিকা চ সুজাতা চ নাম গ্রামিকদুহিতা আভিঃ কুমারিকাভিঃ বোধি-সত্ত্বায় সর্ব্বে তে যুষবিধয়ঃ কৃত্বোপনামিতা অভূবন্।........ ....তস্য মে ভিক্ষবঃ ষড়্বর্ষব্যতিবৃত্তস্য কাষায়াণি বস্ত্রানি পরিজীর্ণান্যভূবন্। তস্য মে ভিক্ষব এতদভূৎ। স চেদহং কৌপীনং প্রচ্ছাদনম্ লভেয়ং শোভনং স্যাৎ।"

"তেন খলু পুনর্ভিক্ষবঃ সময়েন সুজাতায়া গ্রামিকদুহিতুর্দাসী

রাধা নাম্নী কালগতাঽভূৎ। সা শানকৈঃ পরিবেষ্ট্য শ্মশানমপকৃষ্য ত্যক্তাঽভূৎ। তদহমেবাদ্রাক্ষং পাণ্ডুদুকূলম্। ততোঽহম্ তৎ পাণ্ডুদুকূলম্ বামেন পাদেনাক্রম্য দক্ষিণহস্তং প্রসার্য্যবনতোঽভূবন্তদ্গ্রহীতুম্॥ অথ ভৌমা দেবা অন্তরিক্ষাণাং দেবানাং ঘোষমনুশ্রাবন্তি স্ম। আশ্চর্য্যমিদং মার্ষা অদ্ভুতমিদম্ মার্ষাঃ। যত্র হি নামৈবং মহারাজকুলপ্রসূতস্য চক্রবর্ত্তিরাজ্যপরিত্যাগিনঃ পাণ্ডু-দুকুলে চিত্তন্নতমিতি অন্তরিক্ষা দেবা ভৌমানাং দেবানাং শব্দং শ্রুত্বা চাতুর্মহারাজিকানাং দেবানাং ঘোষমুদীরয়ন্তি স্ম।”

তারপর হে ভিক্ষুগণ! বোধিসত্ত্ব (ব্রহ্মচারী) জগতের লোককে অদ্ভুত ক্রিয়া দেখাইবার জন্য, প্রাচীন পদ্ধতি অনুযায়ী কর্ম্মক্রিয়া হইতে চ্যুত প্রাণীদিকে পুনরায় কর্ম্মক্রিয়ায় উৎসাহিত করিবার জন্য, পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য, উচ্চ জ্ঞানের গরিমা প্রদর্শন করিবার জন্য, ধ্যান, সমাধি প্রভৃতির শ্রেণী বিভাগ করিবার জন্য, (প্রত্যহ) একটী মাত্র (এক মুষ্টি) তিল, কুল ও তণ্ডুল আহার করিয়া ছয় বৎসর তপশ্চরণ করিতে লাগিলেন। যাঁহার মনে দীনতার (দুর্ব্বলতার) লেশ মাত্র নাই, সেই বোধিসত্ত্ব পর্য্যঙ্কে (আসনে) একই ভাবে উপবেশন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি ঈর্ষার পথের পথিক হইলেন না। রৌদ্র হইতে ছায়ায় গমন করিলেন না, ছায়া হইতে রৌদ্র উপভোগ করিবার প্রয়াস পাইলেন না; ঝড়, বৃষ্টি, রৌদ্র হইতে পরিত্রাণ পাইবার চেষ্টা করিলেন না; অধিক

কি, দংশ, মশক, সরীসৃপ প্রভৃতিকে বিতাড়িত করিলেন না। তিনি বিষ্ঠা, মূত্র, শ্লেষ্মা, নাসিকামল, প্রভৃতি ত্যাগ করিলেন না। একবারও জানুদ্বয় প্রসারিত করিলেন না। তাঁহার পার্শ্ব, উদর, পৃষ্ঠদেশ প্রভৃতি বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত করিলেন না। মহামেঘ সকল, দুর্দ্দিন বর্ষা, শরৎ, গ্রীষ্ম, হৈমন্তিকা বোধিসত্ত্বের গায়ে নিপতিত হইতে লাগিল। এমন কি হাত দিয়াও বৃষ্টি ধারা রোধ করিবার চেষ্টা করিলেন না বা ইন্দ্রিয় সকলকে বিপথে লইয়া যাইলেন না, অথবা রূপ রস প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ার্থে নিয়োগ করিলেন না। যে সমস্ত গ্রাম্য কুমার বা কুমারিকা বা গো-পালক বা পশুপালক বা তৃণহারিকা বা কাষ্ঠহারিকা বা গোময়হারিকা আসিত, তাহারা বোধিসত্ত্বকে পাংশু-পিশাচ বলিয়া মনে করিতে লাগিল, তাঁহাকে লইয়া ক্রীড়া ও কৌতুক করিত ও গায়ে ধূলি লেপন করিত।

প্রথম হইতে দুষ্কর তপস্যাকারী বোধিসত্ত্বকে দেখিবার জন্য, বন্দনা করিবার জন্য, পরিচর্য্যা করিবার জন্য দশখানা গ্রামপতিদের কুমারী কন্যারা সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। একটী (একমুষ্টি) কুল বা তিল বা তণ্ডুল প্রদান করিতে লাগিল। কোন কন্যার নাম বলা, কাহারো বা নাম বলগুপ্তা, প্রিয়া, সুপ্রিয়া প্রভৃতি; কাহারো নাম বিজয়সেনা, অতিমুক্তকমলা, সুন্দরী, কুম্ভকারী প্রভৃতি; কাহারো নাম উলুবিল্লিকা, জটিলিকা, সুজাতা প্রভৃতি। এই সমস্ত কন্যা

বিধিপূর্ব্বক বোধিসত্ত্বের সেবা করায় তিনি প্রত্যেককে উপাধি দান করিলেন।

ছয় বৎসর কাটিয়া যাওয়ায় তাঁহার কাষায় বস্ত্র জীর্ণ হইয়া পড়িল। তখন তাঁহার মনে এই হইল, যদি তিনি একটী কৌপীন পরিতে পান তবে তাঁহাকে বেশ সুন্দর দেখায়।

ঠিক্ সেই সময়ে গ্রামিক কন্যা সুজাতার রাধা নাম্নী দাসী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাহাকে বাহকগণ শ্মশানে লইয়া গিয়া ফেলিয়া আসে। তিনি তা'র অঙ্গের পাংশুবর্ণের বস্ত্র দেখিলেন : তিনি সেই বস্ত্রখানি বাম পা দিয়া টানিয়া তাহা লইবার জন্য ঝুঁকিয়া পড়িয়া দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিলেন। অনন্তর পৃথিবীর দেবতারা আকাশের দেবতাদিগকে জয়ঘোষণা শুনাইতে লাগিল। কি আশ্চর্য্য (ব্যাপার)! কি অদ্ভুত (ব্যাপার)! তিনি রাজচক্রবর্ত্তী ঐশ্বর্য্যপরিত্যাগী, মহারাজকুলে তাঁহার জন্ম— তাঁহার কিনা এই বস্ত্রে চিত্ত সংযোগ করিতে হইয়াছিল। ইহা দেখিয়া আকাশের দেবতারা (চাতুর্ম্মহারাজিকা সকল) চতুর্দ্দিকে ঘোষণা করিতে লাগিল।

যখন চাষাদের ছেলে মেয়েরা বুদ্ধের গায়ে ধূলা মাখিয়ে দিল তখন তাঁ'র মনটা স্থূল শরীর ত্যাগ করিয়া কারণ, মহা-কারণে চলিয়া গিয়াছিল। এই জন্য বাহির হইতে তাঁহাকে উন্মাদ-পাগল বলিয়া দেখিতে হইয়াছিল। এই হইল কঠোর সাধন মার্গের পন্থা। ভগবান্ যীশুর সাধন কালে এইরূপ

একচল্লিশ দিন উপবাসের কথা আছে। প্রভু মহম্মদের সাধন কালের উপাখ্যানেতে ঠিক এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের সাধন কালের এইরূপ বহু উপাখ্যান বর্ণিত আছে এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সাধক-জীবনেরও এইরূপ অনেক কথা আছে। এস্থলে এ বিষয়ের একটু বিশদভাবে আলোচনা করিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

বুদ্ধ যখন বোধিদ্রুমতলে বসিয়া কঠোর তপস্যা করিতেছিলেন তখন তাঁহার পিতা কয়েকজন 'বলদে'র' (বলীবর্দ্দ —Caravan) চালকের কাছে সংবাদ পাইলেন যে উলুবিল্ল বনে সিদ্ধার্থের মত দেখিতে একটী যুবক সাধু কঠোর তপস্যা করিতেছে, তাহার শরীর অতিশয় জীর্ণ শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বহু দিবস সে জীবিত থাকিবে কিনা সে বিষয় কিছু ঠিক নাই। বৃদ্ধ রাজা শুদ্ধধন, এই যুবক তপস্বী নিশ্চয় নিজ পুত্র সিদ্ধার্থ হইবে অনুমান করিয়া, মন্ত্রীপুত্র উদঞ্ৰীকে এ বিষয়ের বিশেষ সংবাদ লইবার জন্য প্রেরণ করেন। উদঞ্ৰী উলুবিল্ল বনে বা বুদ্ধগয়াতে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তপস্বীর কাছে যাইয়া উচ্চৈঃস্বরে নাম ধরিয়া সম্ভাষণ করিতে লাগিল, "কুমার সিদ্ধার্থ! তোমার পিতা, রাজা শুদ্ধোদন, তোমার জন্য অতিশয় চিন্তিত আছেন!" ইত্যাদি। বুদ্ধের তখন 'পূর্ব্বস্মৃতি লোপ' হইয়াছিল; এইজন্য তিনি এই সকল কথার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অবশেষে দেহেতে

মন নামিয়া আসিলে তিনি উদঞ্জীর দিকে চাহিয়া অস্পষ্টস্বরে স্বপ্নোত্থিত ব্যক্তির ন্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুমার কা'কে বলে? সিদ্ধার্থ কি? পিতা কি? রাজা কা'কে বলে? শুদ্ধোদন কি?" মন্ত্রীপুত্র উদঞ্জী ঘোর বিষয়ী ব্যক্তি। তিনি বুদ্ধের এই উচ্চ অবস্থার কথা কিছু উপলব্ধি করিতে না পারিয়া পুনরায় বলিলেন, "আমি উদঞ্জী, তোমার বাল্যসখা!" বুদ্ধ তাহাও কিছু বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "উদঞ্জী কি? বাল্যসখা কি?" তখন উদঞ্জী স্থির করিলেন—এ ব্যক্তি একেবারে উন্মাদ হইয়া গিয়াছে—বাপের নাম স্মরণ নাই, নিজের নাম স্মরণ নাই, সম্মুখে আমি উদঞ্জী বাল্যসখা দাঁড়াইয়া রহিয়াছি আমাকেও চিনিতে পারিতেছে না—মস্তিষ্ক একেবারে বিকৃত হইয়া গিয়াছে! তিনি নিজে নিজে বলিতে লাগিলেন, 'বৃদ্ধ রাজার কি বিড়ম্বনা! এইরূপ উন্মাদ পুত্রকে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার কি আবশ্যক! হয় তো গো-যানে যাইতে যাইতেই ইহার মৃত্যু হইবে!' উদঞ্জী বুদ্ধকে এইরূপ উন্মাদ স্থির করিয়া কপিলাবস্তু নগরী ফিরিয়া গেল।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য নিমাইতীর্থের ঘাটে সন্ন্যাস লইবার পর 'একদৌড়ে' বৃন্দাবন দর্শন করিতে যান। শুনা যায়, কাটোয়ার নিমাইতীর্থের ঘাটে তিনি সন্ন্যাস লইয়াছিলেন—"কাঞ্চন-নগরী হল কণ্টক-নগরী।" এই সময়ে তিনি বিভোর হইয়া কাটোয়ার মাঠেতে তিন দিন তিন রাত্রি বিচরণ করিয়াছিলেন। মাঠে

রাখাল বালকগণকে দেখিয়া বৃন্দাবনের গোপবালকগণ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, গঙ্গাকে যমুনা বলিয়া ভ্রম করিয়াছিলেন। যখন শ্রীনিত্যানন্দ তিন দিন পরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন তখন তিনি তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না—শ্রীনিত্যানন্দকে শ্রীবলরাম বলিয়া ভ্রম হইল। কেবলমাত্র "হরিবোল" "হরিবোল" ধ্বনি করিয়া মাঠে বিচরণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে দেহেতে মন কিঞ্চিৎ নামিয়া আসিলে শ্রীনিত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৃন্দাবন কতদূর বল্‌রে নিতাই?" মহাপ্রভুব এই সরল প্রশ্নের ভিতর তাঁহার তখনকার অবস্থার কিঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ যখন কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন তখন তাঁহারও 'পূর্ব্বস্মৃতি লোপ' হইয়াছিল। সেই সময় একটী সাধু আসিয়া তাঁহাকে লাঠি দিয়া প্রহার করিয়া নানা প্রকারে জোর করিয়া তাঁহার মুখের ভিতর অল্পমাত্র দুগ্ধ প্রবেশ করাইয়া দিতেন।

এইগুলি হইল পূর্ব্বস্মৃতি লোপের জ্বলন্ত উদাহরণ। বৈষ্ণব গ্রন্থে ইহাকে 'ভাবাবেশ' বলে। রাজযোগের ভাষায় ইহাকে 'পূর্ব্বস্মৃতি লোপ' বলে—wilful forgetting the past reminiscences। অপর ভাষায় ইহাকে 'নির্ব্বিকল্প সমাধি' বলে। এই অবস্থায় বহুদিন থাকিলে সাধকের দেহ নষ্ট হইয়া যায়। যাঁহারা অবতার বা অবতারকল্প পুরুষ তাঁহাদের এই অবস্থা বহুদিন ব্যাপী হইয়া থাকে। অন্যান্য ব্যক্তির যদি এই অবস্থা

হয়, তাহা হইলে অল্প সময় বা কয়েক দিনের জন্য হইতে পারে। জীবন্মুক্ত পুরুষ মাত্রকেই এই অবস্থায় আসিতে হইবে। অল্প-কালের জন্যই হউক বা অধিক কালের জন্যই হউক, তাঁহাদের এই অবস্থায় আসিতেই হইবে। তাহা না হইলে তাঁহারা কখনই জীবন্মুক্ত পুরুষ হইতে পারেন না।

সমস্ত 'পূর্ব্বস্মৃতি লোপ' করিতে হইলে মহাশক্তির আবশ্যক। The greatest display of energy is in controlling the energy —শক্তিকে সংহত করাতেই মহাশক্তির বিকাশ। শক্তির চঞ্চল বহির্মুখী গতিকে নিবৃত্ত করিয়া তাহাকে অন্তর্মুখী করিতে মহাশক্তির আবশ্যক। মন সর্ব্বদাই স্থূল স্নায়ুতে থাকে এবং সর্ব্বদাই খণ্ডত্ব ও বহুত্ব দর্শন করে এবং তদ্বিষয়ে সামঞ্জস্য করিবার প্রয়াস পায়; কিন্তু মন যখন অতি সূক্ষ্ম স্নায়ুতে গমন করে তখন স্থূল স্নায়ুর প্রক্রিয়াসকল বদ্ধ হইয়া যায়; মনোবৃত্তি (Eircling) বহির্মুখী না হইয়া একেবারে অন্তর্মুখী হইয়া যায়। এইজন্য এই সময় বাহ্যিক পরিদৃশ্যমান জগতের কোন জ্ঞান থাকে না, পূর্ব্বস্মৃতিরও কোন জ্ঞান থাকে না, এমন কি নিজের দেহেরও কোন জ্ঞান থাকে না। ইহা অতি উচ্চ তত্ত্বের কথা; ইহার সহিত উদ্‌ভ্রান্ত চিত্ত বা মস্তিষ্ক বিকৃতির কোন সংশ্রব নাই। এই অবস্থায় আসিলে খণ্ডজ্ঞান দূর হইয়া অখণ্ডজ্ঞান লাভ হয়। শ্রদ্ধেয় গিরিশবাবু বলিতেন,— "পূর্ব্বস্মৃতি মিলাইয়া চলে যায় উর্দ্ধ্বস্তরে মন।"

'পূর্ব্বস্মৃতি লোপ' কি তাহার আভাষ আমরা এতক্ষণ কিছু পাইলাম। ইহার বিপরীত অবস্থা 'পূর্ব্বস্মৃতি জাগরণ'—ইহাকে 'বিপর্য্যস্ত ভাব' বলে। বুদ্ধের সাধন কালে প্রথমে তাঁহার 'পূর্ব্বস্মৃতি লোপ' হইল, তিনি আপন বাল্যসখা মন্ত্রীপুত্র উদঞীকে চিনিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যাইলেন। সুজাতা ও তাঁহার দুই কন্যা নন্দা ও বালা সেবা শুশ্রূষা করায় শরীর কিছু সুস্থ হইলে, তিনি পুনরায় বোধিদ্রুম তলে ধ্যান করিতে বসিলেন। পূর্ব্বে তাঁহার 'পূর্ব্বস্মৃতি' লোপ হইয়াছিল—এখন সেই 'পূর্ব্বস্মৃতি' সকল একত্রে জাগ্রত হইয়া উঠিল। 'পূর্ব্বস্মৃতি' লোপে মন স্থূল স্নায়ু হইতে সূক্ষ্ম স্নায়ুতে গিয়াছিল—এখন পুনরায় মন সূক্ষ্ম স্নায়ু হইতে স্থূল স্নায়ুতে ফিরিয়া আসিল। "হৈ! হৈ! রৈ! রৈ! পূর্ব্বস্মৃতি জাগে"—গিরিশচন্দ্র। এই 'পূর্ব্বস্মৃতি' জাগরিত হওয়াকেই বৌদ্ধগ্রন্থে 'মারের আক্রমণ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। "মারোস্তু পিশুনঃ।" "পিশুনৌ খলসূচকৌ।" পূর্ব্বে যেমন মন ইন্দ্রিয়গোচর জগৎ হইতে অতীন্দ্রিয় অবস্থায় গিয়াছিল, এখন তেমন মন অতীন্দ্রিয় অবস্থা হইতে ইন্দ্রিয়গোচর জগতে ফিরিয়া আসিল। জীবনের প্রত্যেক ঘটনাটী জীবন্ত বিগ্রহধারণ করিয়া বুদ্ধের সম্মুখে একে একে আসিতে লাগিল। গৃহবাসকালে নর্ত্তকীরা যেমন পুস্পমাল্য উপহার লইয়া তাঁহার গলদেশে দিত ও ওষ্ঠে সুরাপাত্র ধরিত—সেই চিত্র সকল

জীবন্ত মূর্ত্তিতে তাঁহার সম্মুখে আসিতে লাগিল। তাঁহার খুল্লতাত পুত্র দেবদত্ত যে সকল অত্যাচার করিয়াছিলেন তাহার চিত্রও একে একে তাঁহার সম্মুখে আসিতে লাগিল। গভীর রাত্রি—তিনি দেখিলেন যে তিনি উলুবিল্ল বনানীর ভিতর বসিয়া আছেন। তাঁহার সংজ্ঞা হইলে তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "পূর্ব্বস্মৃতি! পূর্ব্বস্মৃতি!—এখনও আমায় কষ্ট দিতেছে!" তিনি ধ্যানে বসিলেন। পুনরায় সেই রাজবাটী ও নর্ত্তকীবৃন্দ! তিনি সংজ্ঞা লাভ করিয়া বলিলেন, "পূর্ব্বস্মৃতি! পূর্ব্বস্মৃতি!—এখনও আমায় কষ্ট দিতেছে!" এইরূপে তাঁহার গৃহবাসকালের সমস্ত ঘটনা গুলি জীবন্ত বিগ্রহ ধারণ করিয়া পরিদৃশ্যমান হইয়া সম্মুখ দিয়া একে একে চলিয়া যাইল। এইরূপ চিত্র দেখাকে 'ভাবদর্শন' বলে—Visualising the Ideas. ইহার পর তিনি 'সাম্য' অবস্থা লাভ করিলেন এবং সৃষ্টির আদি কারণ (বৌদ্ধগ্রন্থে ইহাকে "দ্বাদশ নিদান" বলে) জানিতে পারিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জীবনেও এই অবস্থাটী অন্যরূপে হইয়াছিল; তাহা সকলেই জানেন এইজন্য সে বিষয়ের কিছু উল্লেখ করিলাম না।

বৌদ্ধ গ্রন্থে লিখিত 'মারের' এই আক্রমণ বাহ্যিক নহে—আভ্যন্তরিক। এ সকল হইল উচ্চ তত্ত্বের কথা। তন্ত্রেতে আছে যে, কুণ্ডলিনী শক্তি 'সুষুম্নার' ভিতর দিয়া 'সহস্রারে' যাইলে প্রথমে তথায় অল্পক্ষণ স্থায়ী হইয়া পুনরায় নামিয়া

আসে। দ্বিতীয়বারও এইরূপ 'সহস্রারে' যাইয়া নামিয়া আসে। এইরূপে তিনবার গতাগতি করিলে পর কুণ্ডলিনী শক্তি 'সহস্রার' সহিত সংলগ্ন হইতে পারে।

পূর্ব্বলিখিত বিষয়গুলি নিবিষ্টমনে পর্য্যালোচনা করিলে আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, মহাপুরুষদিগের জীবনের বিভিন্ন অবস্থার ভাব সমুহ বুঝা কেন আমাদের মত সাধারণ লোকের পক্ষে সুকঠিন। মহাপুরুষদিগের জীবনী কিছুমাত্রও বুঝিতে হইলে তাহা অতি সন্তর্পণে ও শ্রদ্ধার সহিত আলোচনা করিতে হয়। তাঁহাদিগের প্রত্যেক ভাব, উচ্ছ্বাস, ক্রিয়াকলাপ, হস্তপদ ও অন্যান্য অঙ্গাদির সঞ্চালন অতি গূঢ় ও গভীর অর্থ হইতে নিঃসৃত হয়। আমরা অনেক সময় তাঁহাদের এই সকল অঙ্গ ভঙ্গীর উচ্চভাব বা অর্থ বুঝিতে না পারিয়া তাহা উপেক্ষা করিয়া থাকি। মহাপুরুষদিগের মন সহসা এত উচ্চ অবস্থায় চলিয়া যায় যে, তাহার ভাব কখনও ভাষা দিয়া প্রকাশ করা যায় না। সেই অবস্থায় তাঁহারা কেবলমাত্র সামান্য একটী অক্ষর (Mental monogram) বা দুই একটী শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকেন; তাহা গভীর ভাব হইতে নিঃসৃত। তাহার অর্থ সাধারণের কেহই বুঝিতে পারে না। এইজন্য মহাপুরুষদিগের উচ্চ ভাব সকল জগতের সাধারণ লোকের নিকট বিলুপ্ত হইয়া থাকে; কেবলমাত্র উপযুক্ত ভাবগ্রাহী সাধকগণ সেই সকল ভাবের কিঞ্চিৎমাত্র আভাষ উপলব্ধি করিয়া নিজেরা ধন্য হন।

এই তো গেল আমাদের মতন সাধারণ লোকের কথা। অপরদিকে মহাপুরুষদিগের যে সকল উক্তি জগতে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে তাহা পাঠ করিলে বেশ দেখিতে পাওয়া যায় যে মহাপুরুষদিগের অন্তেবাসীরাও তাঁহাদের অনেক বিষয়ের ও অনেক ভাবের উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন বা তাহার বিকৃত অর্থ করিয়াছেন। প্রচলিত গ্রন্থ-সমূহে সাধারণতঃ মহাপুরুষদিগের কতকগুলি নীতিবাক্য ও কর্ম্ম-পদ্ধতির (যাহা গ্রন্থকার চিহ্নিত) বিষয়েরই উল্লেখ থাকে মাত্র—যাহাকে বলে Rules for the conduct of life—জীবন পরি-চালনার নিয়মাবলী। এইরূপ গ্রন্থে এই নিয়মাবলীর পালনই ধর্ম্মলাভের একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। সরল সাধারণ লোক ইহাই উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করে। ইহাকেই তাহারা জগতের শ্রেষ্ঠ ও চরম সত্য বলিয়া ধারণা করিয়া আজীবন আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে এবং এই কল্পিত বিধিনিষেধগুলির গণ্ডী কিছুমাত্রও অতিক্রম করা আচারহীন ও ধর্ম্মহীনের কার্য্য বলিয়া মনে করে—কেননা ইহাই গ্রন্থের উপদেশ। মহাপুরুষ-দিগের উচ্চভাব সকলের আভাষ—এই সকল গ্রন্থে কিছুই থাকে না! বলা বাহুল্য, এইরূপ উপদেশের ফলে সহজ, সরল, সবল, উন্নত মানুষের "ভূতে পাওয়া" মানুষে পরিণত হইতে বেশী দেরী হয় না। মানবকুলে এই দুঃখ চিরকালই থাকিবে, আর তাহার কোন প্রতিকারও নাই!

এখন পূর্ব্বকথা অনুসরণ করা যা'ক। বরানগরের মঠে ভদ্র ঘরের শিক্ষিত যুবকেরা যে শুধু মেঝেতে বা একটা ছেঁড়া চ্যাটাইয়েতে পড়ে থাক্‌তেন, মুষ্টিভিক্ষা ক'রে চাল সিদ্ধ ক'রে একটা কাপড়ে ঢেলে খেতেন—এই যে মহা কৃচ্ছ্র সাধনা, ইহা প্রাকৃত লোকের পক্ষে মহা ভ্রান্তপথ বলিয়া বোধ হইয়াছিল এবং বাহিরের সকলেই নানা প্রকার ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও সেইরূপ অবজ্ঞাসূচক মত প্রকাশ করিত; কিন্তু এইরূপ কৃচ্ছ্র সাধনায় এবং কারণ ও মহা-কারণে চিত্ত থাকায় এবং চিত্তবৃত্তি নিরোধ হওয়ায় যে অপরিসীম শক্তি সঞ্চয় হইয়াছিল তাহা প্রাকৃত জনেরা প্রথম অবস্থায় কিছুই বুঝিতে পারে নাই এবং প্রাকৃত জনের পক্ষে কেন ইহা বুঝা সম্ভব নহে তাহাও আমরা দেখিয়াছি। পরে যখন এই শক্তি বিকাশ পাইল তখন যাহারা অবজ্ঞাসূচক মত প্রকাশ করিয়াছিল তাহারা লজ্জিত ও ত্রস্ত হইল এবং সকলেই নিতান্ত অনুগত হইয়া পড়িল। রামকৃষ্ণ-মিশন এখন যে শক্তি বিকীরণ করিতেছে তাহা এই বরানগর ও আলমবাজারের মঠেই উদ্ভূত হইয়াছিল।

সাধন মার্গের বিষয় অতি জটিল ও গূঢ়। কে, কি ভাবে, কখন, কিরূপ সাধন করিতেছেন তাহা কখনও প্রকাশ করিতেন না এবং এ বিষয়ে কেহ কাহাকেও কোন প্রশ্ন করিতেন না। কেবল মাত্র মুখের ভাবভঙ্গী, চক্ষুর দৃষ্টি ও পদবিক্ষেপ দর্শন করিয়া তাহার সামান্য কিছু কিছু আভাস পাওয়া যাইত।

এইজন্য এই সময়কার মনোভাব বা চিত্তবৃত্তির কথা কিছুই বলা যায় না এবং বলাও যুক্তি সঙ্গত নয়। ভবিষ্যতে যিনি সাধক হইবেন তিনি নিজের সম্মুখে এই আদর্শ রাখিয়া চলিবেন। এতদ্ব্যতীত বাহ্যিক আভাষ আর বেশী কিছু দেওয়া যায় না। এস্থলে একা তারকদা'র কথা বলিতেছি না, কিন্তু সমগ্র সঙ্ঘের কথা বলিতেছি। তাঁরা সকলেই জগতের বরেণ্য ও প্রণম্য।

তারকদা'কে এই কালে দেখিতাম যেন সব সময় তিনি বিভোর, আত্মহারা, বাহ্যিক বস্তুর সহিত কোনও সংশ্রব নাই। এমন কি, দেহের সঙ্গেও যেন বিশেষ সম্পর্ক নাই। যেন দেহ ত্যাগ করিয়া মন কোন গভীর চিন্তায় রহিয়াছে বা কোন উচ্চস্থানে চলিয়া গিয়াছে। বিদেহ ভাবের যে সকল কথা শাস্ত্রাদিতে পাঠ করা যায়, সেই সময় তারকদা ও আর আর সকলকে দেখিলে তাহা স্পষ্ট পরিলক্ষিত হইত।

এই সময় তারকদা'র কথা, চক্ষের দৃষ্টি ও পদবিক্ষেপ অতি মধুর হইয়াছিল। কথাগুলি এক এক দিন এমন স্নেহপূর্ণ, মিষ্ট ও স্নিগ্ধ হইত যে, যাঁহারা শুনিয়াছেন এবং স্মরণ রাখিয়াছেন তাঁহারা আমার এ সকল কথা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। মন যখন স্থূল শরীরে থাকে তখন মনোবিকাশ পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুযায়ী ও প্রতিবন্ধকতা অনুযায়ী কখনও বা নম্র, কখনও কর্কশ বা তীব্র ও তিক্ত হইয়া থাকে—সাধারণ লোকের ভিতর যাহা দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু মন যখন সূক্ষ্ম বা কারণ

দেহে বাস করে তখন সেইখান হইতে যে শক্তি বা স্পন্দন, কণ্ঠনালী, চক্ষু, হস্ত বা চরণ দিয়া বিকাশ পায় তা' অতীব মধুর ও হৃদয়স্পর্শী। ইহাকে সাম্য স্পন্দন বা Rhythmical vibration বলে। তারকদা'র ভবিষ্যৎ জীবনে বা শেষ জীবনে যে একটা অসীম ভালবাসা, স্নেহপূর্ণ ভাব, মধুর কণ্ঠস্বর ইত্যাদি ভাব, যাহা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাহা এই সাম্য স্পন্দনেরই বিকাশ। বরানগর মঠে সাধন কালে এই ভাবটা অনেক পরিমাণে দেখিয়াছিলাম। ইহাকেই বলে বিদেহ অবস্থা। এইটাই হইল সাধকের উচ্চ অবস্থার গজকাটী। এই সময় একটা কথা প্রায় সকলেই বলিতেন—"নিস্ত্রৈগুণ্যে পথিবিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ" অর্থাৎ ত্রিগুণাতীত পথে যে বেড়ায়, তা'র কাছে বিধি নিষেধ আর কি জিনিষ!

বুদ্ধ যখন সুজাতার বাড়ীতে কয়েক দিন ছিলেন তখন নন্দা ও বালা নামে দুইটী কণ্যকা বুদ্ধের শুশ্রূষা করিয়াছিল। কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া তিনি পুনরায় বোধিদ্রুমের পাদদেশে গমন করিলেন। পূর্ব্বে এ কথার উল্লেখ করা হইয়াছে। ললিতবিস্তরে বুদ্ধের এই সময়কার পদবিক্ষেপের বর্ণনা আছে। গজবৎ, সিংহবৎ, শশকবৎ, ভেকবৎ ইত্যাদি শতাধিক পদ-বিক্ষেপের বর্ণনা আছে অর্থাৎ বুদ্ধের মনোভাবটা পথের চলন দিয়া প্রকাশ পাইয়াছিল। তাঁহার মনে এত তীব্র আবেগ

আসিয়াছিল যে তাঁহাকে ভূমি পৃষ্ঠে পদবিক্ষেপ করিতে দেখিলে বোধ হইত যেন তিনি সমস্ত জগৎ ও প্রতিবন্ধককে পদদলিত করিবেন। অর্দ্ধপথে সামঞ্জস্য করা বা পরাজিত হইয়া থাকা উদ্দেশ্য নয়। বিজয় বা মৃত্যু—এই ছিল তাঁর প্রতিজ্ঞা। "সংগ্রামে মরণং শ্রেয়ো ন চ জীবেৎ পরাজিতঃ।" এইরূপ ভাব বরানগর মঠে দেখিয়াছিলাম। এই পদবিক্ষেপ বা দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাব শুধু যে তারকদা'র হইয়াছিল এমন কথা বলিতেছি না; সেই সময় সকলেরই ভিতর অল্প বিস্তর এইভাব হইয়াছিল এবং নরেন্দ্রনাথের পদবিক্ষেপে ইহা আরও স্পষ্ট হইত। বৌদ্ধ গ্রন্থে বুদ্ধের সাধনার বিষয় বিশেষরূপ অবগত না হইলে বরানগর মঠের সকলের তপস্যার এইরূপ ভাব কেহই উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। বুদ্ধের তপস্যা যেন বরানগর মঠে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল।

অসঙ্গ বা নিঃসঙ্গ ভাব—

বরানগর মঠে প্রথম সকলেরই ভিতর একটা ভাব দেখা যাইত—নির্লিপ্ত ও আকাঙ্ক্ষা বিরহিত ভাব, ইহাকে নিঃসঙ্গ ভাব বলে। সাধারণ জীবের সংসার ও জগতের উপর অতীব অনুরাগ থাকে। তাহারা মনে করে—'আমরা মনের শক্তি দিয়া সংসারের দ্রব্যাদি ক্রয় করিব বা দ্রব্যাদির আরও বৃদ্ধি করিব।' পক্ষান্তরে ইহাও দেখা যায় যে, সংসারের দ্রব্যাদিই তাহাদের মনকে জয় করিয়াছে। দার্শনিক ভাবে দেখিতে হইলে ইহা

বলা যায়, যে ব্যক্তি যে পরিমাণে মন দিয়া জগতের দ্রব্যাদি আত্মাধীনে আনিবার চেষ্টা করিয়াছে অর্থাৎ সংগ্রহ করিয়াছে, জগতের দ্রব্যাদিও অন্যরূপে সেই পরিমানে তাহার মন অধিকার করিয়াছে। I possess the objects, the objects possessing my mind—আমি দ্রব্য অধিকার করিতেছি, দ্রব্যও আমার মনকে অধিকার করিতেছে। এমন কি, অনেক সময় পার্থিব দ্রব্যাদি প্রায় সমস্ত মনটাকে অধিকার করিয়া ফেলে। এইজন্য, দ্রব্যাদির উপর তাহাদের এত আকাঙ্ক্ষা ও লিপ্সা! এইজন্য, এই সকল ব্যক্তিরা কোন উচ্চতর চিন্তা করিতে পারে না এবং উচ্চ চিন্তার কথা শুনিলেই তাহাদের প্রাণে ভয় হয়। পার্থিব কয়েকটী মনোনীত বস্তুর বাহিরে যে জগৎ বলিয়া কিছু একটা আছে বা চিন্তা করিবার কিছু বিষয় আছে এ সকল ভাব তাহারা আদৌ কল্পনায়ও আনিতে পারে না। পার্থিব বস্তুতে তাহাদের অতীব লিপ্সা থাকায় তাহারা অত্যন্ত জড়িত হইয়া পড়ে। বস্তুর কিছুমাত্র বিপর্য্যয় হইলে তাহারা একেবারে চিন্তিত, বিষণ্ণ ও শোকার্ত্ত হইয়া থাকে। স্বর্গ, ব্রহ্ম ইত্যাদি তাহারা ঈপ্সিত কয়েকটীমাত্র বস্তুর ভিতর দেখে। এতদ্ব্যতীত মোক্ষ, মুক্তি, ব্রহ্ম ইত্যাদি কোন ভাবই তাহাদের হৃদয়ঙ্গম হয় না। এইটী হইল সাধারণ লোকের ভাব।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ এই ভাবের একটী বিপরীত ভাবের কথা বলিয়াছিলেন—"ত্যাগ" ও "বৈরাগ্য"—পার্থিব বস্তুতে লিপ্সা

রাখিও না। লিপ্সা যে পরিমাণে হ্রাস পাইবে সেই পরিমাণে চিত্ত স্থির হইবে। দার্শনিক ভাষায় ইহার ব্যাখ্যা —মনোবৃত্তি প্রথমে শাশ্বত পদার্থ হইতে বহির্মুখী হইয়া কোন পার্থিব বস্তুকে গ্রহণ করিতে যায়, কিন্তু মনোবৃত্তি যখন বহির্মুখী না হইয়া অন্তর্মুখী হয় তখন চিত্তের স্থৈর্য্যভাব বা সাম্যভাব প্রথম উপলব্ধি হয়। এই স্থির বা সাম্যভাব হইতে চিত্তবৃত্তি যে পরিমাণে অন্তর্মুখী হইবে সেই পরিমাণে মনের গতি উর্দ্ধদিকে যাইবে অর্থাৎ সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত হইয়া সুষুপ্ত পন্থা অবলম্বন করিবে; কারণ শক্তি কখনও স্থির থাকিতে পারে না, নিরন্তর একটা গতি অন্বেষণ করিয়া থাকে। সুষুপ্ত গতি যাহার যে পরিমাণে লাভ হইবে তাহার মনোবৃত্তি বা চিত্তবৃত্তি সেই পরিমাণে উচ্চ স্তরে উঠিবে।

এস্থলে এ কথা বোঝা আবশ্যক যে, প্রথম অবস্থায় মন যদিও ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু তখনও একটা গ্রহণীয় আধার অন্বেষণ করিতেছে। এই গ্রহণীয় আধার, সৎ বা উত্তম হইলেও বাহিরের—ভিতরের নহে। ইহাকে সাপেক্ষ ভাব বলে অর্থাৎ চিত্তের গতি বাহ্য কোন বস্তুর অনুযায়ী চলিতেছে। এইরূপ অনুযায়ী বা সাপেক্ষ ভাব কিছুদিন থাকিলে চিত্তবৃত্তি নব পন্থা অন্বেষণ করে। তাহাকে নিরপেক্ষ ভাব বলে অর্থাৎ বাহ্য কোন বস্তুতেই সাধকের মন আকৃষ্ট হইতেছে না। সে তখন তদূর্দ্ধ কোন বস্তুর অন্বেষণ করিতেছে। প্রথম অবস্থায়, এই পরি-

বর্ত্তন কালে মহা বিষণ্ন, হতাশ, নাস্তিকভাব ইত্যাদির চিন্তা আসিয়া থাকে। পথটী অন্ধকারময়! অল্পদিন এই অবস্থায় থাকিলে অন্তর্দৃষ্টির প্রথম উদ্রেক হয় এবং অন্তরের ভিতর যে নানা উচ্চবস্তু আছে তাহার প্রথম আভাষ পায়। তখন আয়তন বিশিষ্ট বাহ্য বস্তু ত্যাগ অরিয়া অন্তরের ভিতর যে ভাবই থাকে সেই ভাবটী যে জীবন্ত, প্রাণপূর্ণ বস্তু তাহা প্রথম অনুভব করে। পরিধি-বিশিষ্ট বস্তুই পরে ভাবরূপে পরিণত হয়। পক্ষান্তরে ভাবই পরিধি-বিশিষ্ট বাহ্য বস্তু হয়। এই অবস্থাকে নিরপেক্ষ ভাব বলে। পুণ্যশ্লোক স্বামী বিবেকানন্দ লণ্ডনে রাজযোগের বক্তৃতা কালে একবার বলিয়াছিলেন, "আমি ভারতবর্ষের মন্দিরে মন্দিরে প্রণাম ক'রে মাথা কপাল ফুলিয়ে ফেলেছিলুম; কিছুদিন পরে হঠাৎ মনে এলো যে, মন্দির তো ঢের প্রণাম করলুম, কিন্তু আমার নিজের কি হ'য়েছে? তখন মনে একটা বড় বিষণ্ন ভাব এলো। সবদিক অন্ধকারময় দেখ্‌লুম! বুঝ্‌লুম, সমস্ত পরিশ্রম পণ্ড হ'য়েছে। এইরূপ ভীষণ যন্ত্রণাপ্রদ অবস্থায় কিছুদিন থাক্‌বার পর হঠাৎ মনে এলো, যদি কিছু থাকে তো ভিতরেই আছে—বাহিরে কিছুই নাই। এইজন্য ভিতরটা দেখ্‌বার চেষ্টা কর্‌লুম। বৃত্তি সকল অন্তর্মুখী কর্‌লুম। তাহার পরে ধীরে ধীরে নব নব উচ্চভাব প্রকাশ পেতে লাগ্‌ল। জগতকে অন্য প্রকারে—নূতন ভাবে দেখ্‌তে লাগ্‌লুম।" এই দুইটী হইল সাপেক্ষ ও নিরপেক্ষ

ভাব—Inter-dependant Ideas and Non-Inter-dependant Ideas: বরানগর মঠের যে তীব্র বৈরাগ্য ও কঠোর তপস্যার কথা বলা হইয়াছে তাহা এই দুইটী ভাবেরই নানারূপ বিকাশ মাত্র।

যা'হোক, মঠে এই নিঃসঙ্গ বা অসঙ্গ ভাবটা মূলমন্ত্র ছিল। প্রত্যেক লোককেই দেখিতাম—শিবানন্দ স্বামীকে বিশেষ করিয়া দেখিতাম, যেন তিনি জগত হইতে নির্লিপ্ত হইয়া আছেন—জগতে আছেন কিন্তু জগতের সহিত কোনই সংশ্রব রাখেন না। এস্থলে বুঝিতে হইবে যে, জগতের উপর ঘৃণা, দ্বেষ, অবজ্ঞা বা কোন তুচ্ছ-তাচ্ছল্যের ভাব—তাহা নহে। আবাহনও নাই—বিসর্জ্জনও নাই। জগতের প্রতি অভি-সম্পাতও নাই—অনুরাগও নাই। মনটা যেন Neutral zone বা সাম্য শক্তিকেন্দ্রে রহিয়াছে—কোন প্রকার চিত্ত বিক্ষোভ থাকিত না। জগতের কোন বস্তুতে আকাঙ্ক্ষা নাই, লিপ্সা নাই। জগতের কোন বস্তু যে ত্যাজ্য বা ঘৃণিত তা'ও নহে। ঠিক্ মধ্য অবস্থায় মনটা থকিত। পক্ষান্তরে ইহাও বলা যায় যে, জগৎ যেন একখানি ভ্রাম্যমান চিত্র হইয়া সম্মুখে পরিভ্রমণ করিত; কিছু নেবারও নাই, কিছু দেবারও নাই। বহির্জগতে মন যেমন নির্লিপ্ত ও নিঃসঙ্গ হইল, নিজের অন্তর্বৃত্তিতেও উহা সেইরূপ নিঃসঙ্গ ও অসঙ্গ হইল; অর্থাৎ মন আর দেহের মধ্যে যে নিতান্ত সংশ্লিষ্ট ভাব আছে, তাহা ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হইল। প্রথমে মন দেহের

ভিতর বাস করিত, কিন্তু দেহীরূপে থাকিত। ক্রমে ক্রমে দেহের মমতা হ্রাস পাইতে লাগিল। তাহার পর মন উর্দ্ধগতি হইতে লাগিল। প্রথম সাধন অবস্থায় মন ভ্রাম্যমান জগৎ হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া উর্দ্ধগতিতে যায় এবং এই বিশ্লিষ্ট চিৎশক্তি ধীরে ধীরে উর্দ্ধগতিশীল হইয়া ব্রহ্মে লীন হয়; কিন্তু পুনরায় মন যখন ব্রহ্ম হইতে অর্থাৎ ব্রহ্ম স্পর্শ করিয়া দেহে ফিরিয়া আসে, তখন মন আর এক নূতন ভাব ধারণ করে—সমস্তই হচ্চে ব্রহ্মময় জগৎ। "চিন্ময় শ্যাম, চিন্ময় ধাম, চিন্ময় নাম।" ব্রহ্ম চিন্ময়, জগৎ চিন্ময় এবং নামরূপ সংযুক্ত দ্রব্যও চিন্ময়। তখন সকল বস্তুর উপর একটা ভালবাসা পড়ে; কিন্তু সঙ্কীর্ণ মমতা নয়। ভালবাসা ও সঙ্কীর্ণ মমতায় বিশেষ পার্থক্য আছে। সঙ্কীর্ণ মমতাই হইতেছে সাধারণ লোকের লক্ষণ; কিন্তু জীবন্মুক্ত পুরুষের লক্ষণ হইতেছে ভালবাসা বা আত্মপ্রসারণ—Self-expansion. স্বামী বিবেকানন্দের, স্বামী ব্রহ্মানন্দের ও স্বামী শিবানন্দের জীবনের শেষভাগে এই ভালবাসাটাই প্রধান আকর্ষণী শক্তি হইয়াছিল।

যদি কোন ব্যক্তি সমক্ষেত্রে অপরকে ভালবাসিতে যায়, তাহা হইলে অল্পদিন পরে বিরক্তি ও বিচ্ছেদের ভাব আসে; কারণ, এস্থলে দেহজ ও মাংসজ বা স্বার্থজ ভালবাসা বিকাশ পাইতেছে। স্বার্থ পরিসমাপ্তি হইলেই ভালবাসা বিদ্বেষভাবে পরিণত হয়। ইহা সংসারে নিত্যই ঘটিতেছে! আত্মপ্রসারণ

অনুরূপ। নিজের ভিতরকার "অহং" বা সুষুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করিয়া ব্রহ্মে অর্পণ করিতে হয় এবং ব্রহ্ম হইতে ও ব্রহ্মের ভিতর দিয়া জগতকে দেখিতে হয়। তাহা হইলে জগতের সকল বস্তুর উপর একটা ব্রহ্মের আভা বা আবরণী শক্তি পরিলক্ষিত হয়। ইহাতে মাংসজ বা স্বার্থজ কোনও ভাব নাই। এইজন্য, এই ভালবাসা চিরস্থায়ী হয়। গণিতের ভাষায় বলিতে গেলে ইহা একটা বিস্ফারিত বর্ত্তুলের (Parabola) মত হইয়া যায়। যদি ভালবাসার গতি সরলরেখায় (Straight line) হয়, তাহা হইলে অল্পদিন পরে বিপরীত ভাব আসিবে; কিন্তু যদি ভালবাসা বিস্ফারিত বর্ত্তুলের (Parabola) আকৃতিতে যায়, তাহা হইলে তাহাকে চিরস্থায়ী ভালবাসা বলা যায়। অপর কথায় এই ভালবাসাকে ত্রিকোণ প্রেম (Triangle of Love) বলে। ইহাতে সাধক, ব্রহ্ম ও জীবে পরস্পরে সংশ্লিষ্ট সম্পর্ক আছে। সাধকের চিত্ত ব্রহ্মে যাচ্চে; ব্রহ্ম থেকে জীব উৎপন্ন হচ্চে। সেইজন্য, সাধক জীবকে ভালবাসে। নিজের ব'লে নয়—ব্রহ্মের জীব ব'লেই তা'কে ভালবাসে। আবার জীবে ও ব্রহ্মেতে সংশ্লিষ্ট ভাব আছে। এইজন্যই ব্রহ্মই জীব, জীবই ব্রহ্ম। এই কারণে সাধক যখন এই অবস্থায় আসেন—যখন পরাভক্তি ও কৈবল্য প্রেমেতে আসেন, ভালবাসার জন্যই ভালবাসেন, কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করেন না, তখন তাঁ'র জীবের প্রতি একটা ভালবাসা আসে। ইহাকে বলে অহৈতুকী

প্রেম। তখন সব বস্তুই তাঁ'র প্রণম্য হয়। তখন তাঁ'র কাছে সব বস্তুই ব্রহ্মের রূপান্তর মাত্র। শিবানন্দ স্বামী প্রমুখ সকলের ভিতর শেষকালেতে যে একটা কৈবল্য প্রেম ও পরাভক্তি স্রোতোরূপে প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা বরানগর মঠে নিঃসঙ্গ ভাবে থাকারই পরিণতি। বৈষ্ণব ভাষা দিয়া বলিতে হইলে—ভক্তির ভাষা দিয়া বলিতে হইলে, এই বলিতে হইবে—His name, His associations, His face, the persons that He talked with, the places He resorted to, the things that He touched are all sacred to me, because they belong to my Beloved. I live, I move, I smile, because my Lord is pleased to see them. I cannot be miserable, because He never likes it ; but if any misery comes, I then too rejoice, as it is a special gift of my Beloved. It is not the "I" of the body suffers. It is for His sake my mind spontaneously flows towards others. Every creature on earth belongs to Him. I am of His and they are of mine. He is my Lord—My Master, the pupil of my eyes, the smile of my lips, the very pith and marrow of my bones, the very blood that courses through my veins. I am His entirely—absolutely.

ভালবাসা—

এই সময় পরস্পরের মধ্যে একটা গভীর ভালবাসা ছিল।

এই রকম ভালবাসা জগতের ইতিহাসে খুব অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রন্থে আছে যে, যীশুর শিষ্যদের ভিতর পরস্পরের মধ্যে এইরূপ ভালবাসা ছিল। চৈতন্যের পারিষদ-দিগের মধ্যেও এইরূপ একটা প্রগাঢ় ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল। এই সকল হইল গ্রন্থের কথা, চোখে দেখা যায়নি ও অনুভব করা যায়নি; কিন্তু বরানগর মঠে শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণের আত্মগোষ্ঠীর ভিতর, ত্যাগী ও গৃহী উভয়ের ভিতর, এক আশ্চর্য্য রকমের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসা দেখা গিয়াছিল। জীবন্ত ভালবাসাই ছিল বরানগর মঠের প্রাণস্বরূপ। এই প্রাণশক্তির ভিতর যাঁহারা আসিয়াছিলেন বা যাঁহারা এই প্রাণশক্তি স্পর্শ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কেন্দ্রের দিকে সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। শাস্ত্র অধ্যয়ন, জপ, ধ্যান ও তপস্যা নিশ্চয়ই প্রশস্ত মার্গ ও উচ্চ অবস্থার বস্তু, কিন্তু এই জীবন্ত ভালবাসা সম্ভবতঃ তপস্যারও উপরে। এই ভালবাসার ভিতর একটী মহা আকর্ষণী শক্তি ছিল। তাহা ভাষা দিয়া বুঝাইবার নয়। যাঁহারা অনুভব করিয়াছেন তাঁহারা এটা বুঝিতে পারিবেন। প্রত্যেকে যেন দেখিতেন যে শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণের শক্তি, ভাব অপরকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছে। এইজন্য, অপরের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি দেখান ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করা একই জিনিষ ছিল। অপরকে সেবা করা, অপরকে সম্মান দেখান, অপরকে ভক্তি করা, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকে

সেবা করা ও ভক্তি করার সমানই ছিল। যীশু একস্থানে এইভাবে বলিয়াছিলেন,—"যে আমার শিষ্যদের তৃষ্ণার সময় এক বাটী জল পান করা'বে, সে জল আমাকেই পান করানোর সমান হইবে।" বরানগর মঠেও ঠিক সেই ভাবটী পরিলক্ষিত হইত। এই সময়ে গৃহী ও ত্যাগী বলিয়া কোন বিশেষ পার্থক্য ছিল না। সবই এক ছিল। এইজন্য, পরস্পরের প্রতি এক অশ্রুত-পূর্ব্ব ভালবাসার স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। প্রত্যেকেই যেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের রূপান্তর মাত্র। এই ভাবটী প্রবল থাকায় শারীরিক এত কষ্ট, এমন কি এত লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াও সকলে একত্রিত হইতে পারিয়াছিলেন। শরৎ মহারাজ একদিন আক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—"কিছুই তো হ'ল না! কিই বা কর্‌লুম, কিই বা পেলুম! ভিক্ষে ক'রে খাওয়া, পথে পথে ঘোরা, মেঝেতে আর রাস্তা ঘাটে প'ড়ে থাকা—এইতো দেখ্‌ছি ফল! কিছু পাইনি তো বাপু! আর কিছু পাব কিনা তাও তো বুঝ্‌তে পার্‌ছি না! সব অন্ধকার! তবে পরস্পরে একটা বড় ভালবাসা, সেইজন্য প'ড়ে থাকি! পরস্পরকে ছেড়ে যেতে পারি না! তা ভদ্রঘরের ছেলে হয়ে ভিখারী পর্য্যন্ত হ'লুম! কিই বা হ'ল! তা বাড়ীও ফিরে যেতে পাচ্ছিনি! সে কথা মনে কর্‌লে একটা ভয়, ঘৃণা আসে! একসঙ্গে থাক্‌তে ভাল লাগে তাই প'ড়ে আছি!" শরৎ মহারাজের মনটা এই সময় বড় বিষণ্ণ হয়েছিল। এই সামান্য কথাটীতে,

তাঁহাদের পরস্পরের ভিতর কি অদ্ভুত ভালবাসা ছিল তা'র কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

বিষণ্ণ ভাব—

এস্থলে জানা আবশ্যক, গৃধ্রকুট পর্ব্বতে তপস্যা করিবার কালে, ভগবান্ বুদ্ধেরও এইরূপ বিষণ্ণভাব আসিয়াছিল; এই ভাব তাঁ'র মনে এত প্রবল হইয়া উঠিল যে, তিনি দেখিলেন যে, অনাচ্ছাদিত অবস্থায় তিনি গৃধ্রকুট পর্ব্বতের উপর বসিয়া আছেন, মস্তকের উপর প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড অগ্নিসম কিরণ বিকীরণ করিতেছে, জঠরে বৈশ্বানর মহাপ্রবল হইয়া রহিয়াছে এবং হৃদয়ের ভিতর সন্তাপ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে। এই ত্রিবিধ অগ্নির ভিতর তিনি অবস্থান করিতেছেন। পরে তাঁ'র মনে এই প্রশ্ন উদয় হইল—কিই বা করিলাম! বাড়ী থাক্‌তে মনের যে ভাব ছিল এখনও ঠিক সেই ভাব! কিছুই তো পাইলাম না! কেবলমাত্র ভিক্ষা করে খাওয়া আর মাঠে পড়ে থাকা—এই যা তফাৎ! তারপর হটাৎ তাঁ'র মনে আর একটা ভাব আসিল—So long as a Brahman or a Sramana has the the least tinge of desire in him he cannot attain Liberation and what I am doing is nothing but this. যতক্ষণ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ বা শ্রমণের ভিতর বাসনার কোনও অঙ্কুর পর্য্যন্ত থাকিবে ততক্ষণ তাহার মুক্তি হইবে না; কিন্তু আমি কি করিতেছি? সবই তো তাই রহিয়াছে! স্বামীজিও রাজযোগের বক্তৃতা কালে

বলিয়াছিলেন,—"To fry the seeds of Desire." **বাসনার** বীজকে ভেজে ফেল্‌তে হ'বে বুদ্ধের এই চিন্তা এইরূপ পুঞ্জীকৃত ও নিবিড় হইয়া উঠিল যে, তিনি গৃধ্রকুট পর্ব্বতের শিরোভাগ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া নিম্ন ভূমিতে উপনীত হইলেন এবং উন্মত্তের ন্যায় উলুবিল্ল বনানীর (বুদ্ধগয়া) ভিতর প্রবেশ করিয়া নিঃসঙ্গ, নিশ্চেষ্ট, নির্ব্বাক ও নিষ্ক্রিয় হইয়া তপস্যা করিতে মনঃস্থ করিলেন।

এইরূপ কিছুকাল তপস্যা করিবার পর সহসা এক অশরীরি-বাণী তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল। সহসা কে যেন বলিল, "সংগ্রামে মরণং শ্রেয়ো ন চ জীবেৎ পরাজিতঃ"—যুদ্ধ ক'রে মরা ভাল কিন্তু পরাজিত হ'য়ে বেঁচে থাকা ভাল নয়। এইজন্য, ভগবান্ বুদ্ধ বলিলেন,—

"পুনরায় বসি মহাধ্যানে,
ত্যজিয়াছি সকল মমতা,
জীবনে মমতা কেন আর ?"—গিরিশচন্দ্র।

কয়েক বৎসর কঠোর তপস্যা করিবার পর অনেকের মনে বিপরীত ভাব আসিল। এই কয়েক বৎসর যে তপস্যা করিয়াছিলেন তাহাতে কোন ফল বা দর্শন না হওয়ায় একেবারে বিষাদ ভাব ও নাস্তিকতা মনে আসিল। নরেন্দ্রনাথ ছিলেন নির্ভীক ও শক্তিমান পুরুষ। তিনি কোন ভয় ডর রাখিতেন না বা কাহারো খাতির রাখিতেন না। এইজন্য তিনি স্পষ্টভাবে

সংশয়, বিষাদ ও নাস্তিক ভাবটা প্রকাশ করিয়া বলিতেন। শরৎ মহারাজের বিষণ্ণ ভাবের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তিনি আমার সঙ্গে অনেক সময় যেরূপ ভাবে কথা কহিয়াছিলেন তাহাতে বুঝিয়াছিলাম নাস্তিক ভাবটা তাঁহারও ভিতর কিছু পরিমাণে আসিয়াছিল। শিবানন্দেরও ভিতর এই নিরাশ, বিষাদ, অনিশ্চিত ভাবটা অল্পবিস্তর দেখা গিয়াছিল। এইটী সাধকের বিশেষ করিয়া লক্ষ্য রাখিবার বস্তু। এইটী হইতেছে উচ্চপথে যাইবার একমাত্র আবশ্যকীয় সোপান। ইহা উপেক্ষা করিবার বিষয় নয়। সাধকের মন অনবরত পরিশ্রম করিয়া এক বিপরীত ভাবের কেন্দ্রে (Point of pollarisation) আসিয়া উপনীত হয়। তিনি পূর্ব্বে যে সকল চিন্তা ও ধ্যান করিয়াছেন তাহা সব বিলুপ্ত হইল ! সহসা সম্মুখে অপর জগৎ, অপর ভাব আসিল ! এই সময়টা সাধক উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠেন। এই বিপরীত ভাব ও কেন্দ্রে কিছুদিন অবস্থান করিবার পর পুনরায় নব ভাব আসিয়া পড়ে। শরৎ মহারাজ অনেক সময় আলোর উদাহরণ দিয়া এই Point of pollarisationএর কথা বলিতেন। কেহ কেহ বা দর্শনের মত দিয়া ব্যাখ্যা করিতেন— "অস্তি"—"নাস্তি" হয়; "নাস্তি"—"অস্তি" হয়। Positiveটা Negative হ'য়ে যায় ও Negative টা Positive হ'য়ে যায়। আর ব্রহ্ম হইতেছে "অস্তি" "নাস্তি" বিবর্জ্জিত।

যাহা হউক, এই সময় সকলের ভিতর সন্দেহ বা বিপরীত

ভাবের কেন্দ্র প্রকাশ পাইয়াছিল। দর্শন শাস্ত্রের নিয়ম হইতেছে যে—সন্দেহ হইতে নিশ্চয়াত্মিকা জ্ঞান আসে—From doubt comes certitude. এই সন্দেহ যাহার যে পরিমাণে প্রবল হইবে পরে তাহার সেই পরিমাণে নিশ্চয়াত্মিকা জ্ঞান প্রবল হইবে। প্রথম জগতকে সন্দেহ, তারপর নিজের শরীরকে সন্দেহ, নিজের মনকে সন্দেহ—এমন কি নিজের সত্ত্বাকেও সন্দেহ। এই জায়গাটা অতি কষ্টকর, অতি ভীষণ; কিন্তু এই অন্ধকার সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়াই পথ! যখন নিজের অস্তিত্বেই সন্দেহ হইল তখন কিবা উদ্দেশ্য? কিবা ভগবান? "কিবা ব্রহ্ম? কোথা তা'র স্থান?" বাহ্যজগত সাধককে স্থির করিল যে, সে উন্মাদ-পাগল হইয়া গিয়াছে; কি বলে, কি করে, কিছুই বোঝা যায় না। এই অবস্থায় কিছু দিন থাকিবার পর আস্তিক্য জ্ঞান আসে। এই ভাবটী আমি সকলেরই ভিতর অল্প বিস্তর দেখিয়াছিলাম; কিন্তু স্বামীজির ভিতর খুব বেশী পরিমাণে দেখিয়াছিলাম।

বুদ্ধদেবের সাধন অবস্থায় যে সকল ভাব, যে সকল পরিবর্ত্তন, যে সকল অবস্থা হইয়াছিল—যে সকল নির্য্যাতন, চিত্তভ্রম, নবপ্রকার চিন্তা, যাহা আমরা 'ললিতবিস্তরঃ' এবং 'মহাবিনিক্রমণসূত্র' বা Dr Samuel Beal প্রণীত 'Romantic Life of Gautama Budha' নামক গ্রন্থেতে পাই, সেই বুদ্ধের তপস্যার বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিলে, বরানগর

মঠে তারকনাথ, নরেন্দ্রনাথ, প্রভৃতি সকলেরই ভিতর বহুল পরিমাণে যে সেই ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল তাহা পরিলক্ষিত হয়—ইহা আমরা পূর্ব্বেও দেখিয়াছি। একে যে অন্যের অনুকরণ করিয়াছিলেন এ কথা বলিতেছি না; কারণ তখন বুদ্ধের জীবনীগ্রন্থ সকলের এত প্রচলন ছিল না। আমি পরে এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া মিলাইয়া দেখিয়াছি। বুদ্ধের জ্বলন্ত তপস্যার বিবরণ ও রাজযোগের প্রক্রিয়াসকল এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের তপস্যার নানাবিধ সোপান ও মার্গ—এই সকল যেন বরানগর মঠের সকলের ভিতর জীবন্ত ও প্রাণপ্রদ-ভাবে প্রতিবিম্বিত ও প্রতিফলিত হইয়াছিল। এই সাধক-জীবন ও তপস্যার কালটাই তাঁহাদের জীবনের অতি শ্রেষ্ঠ অংশ বলিয়া পরিগণিত হইবে। একদিকে যেমন ভীষণ শারীরিক দুঃখ, কষ্ট, লাঞ্ছনা, র্ভৎসনা, অবজ্ঞা, তিরস্কার এবং মনেতে কখনও কখনও পর্ব্বত প্রমাণ সন্দেহ উঠিত, অপরদিকে তেমনি সকলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, একনিষ্ঠ ও উন্নতভাবে তপস্যা করিয়া সমস্ত দুঃখ, কষ্ট, জগতের সম্পর্ক, শরীরের সম্পর্ক—এমন কি মনের সম্পর্ক পর্য্যন্ত ত্যাগ করিবার চেষ্টা করিতে-ছিলেন। আমি এই বিষয় বিশেষ কিছু বলিতে পারিলাম না—বলিবার কোন সামর্থ্যও নাই; আভাসাদিতে প্রকৃত অবস্থার কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিতে প্রয়াস করিয়াছি মাত্র। সাধক যখন নিজের জীবনে তপস্যা করিবেন তখন এই বিষয়ে পরিত্যক্ত অংশ

সকল নিজেই বুঝিতে পারিবেন; কারণ এ সব বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কেহই কিছু বলিতে পারে না।

দম্‌দম্ মাষ্টার—

গরমীকাল। রাত্রে বড় ঘরেতে তারকদা শুয়ে আছেন, আমি কাছে বসিলাম। দম্‌দম্ মাষ্টার তখন আসিয়া বসিল। দম্‌দম্ মাষ্টার বা যজ্ঞেশ্বর চন্দ্রের কোন চাকরি ছিল না। তারকদা'র কাছে নিজের কষ্টের কথা জানাইল। তারকদা বলিলেন, "দম্‌দম্, তোমার কষ্ট হয়েছে? তুমি এখানে থাক, খাওয়া দাওয়া কর। সব দেখা শুনা কর। আমরা বাপু সাধু—নিজের জপ ধ্যান কর্‌ব না, এই এক ঝঞ্ঝাট্ বইবো! এ যে দেখছি, ঘর ছেড়ে এসে ঘর বাঁধা! তা বাপু তুমি দেখাশুনা কর! কাউকে বলে তোমায় টাকা দশ ক'রে পাইয়ে দেবো!" এই সব কথা হইলে আমি হাঁস্‌তে হাঁস্‌তে বল্‌লুম, "তারকদা, প্রথম যখন খৃষ্টান্‌রা হ'য়েছিল তা'দের দেখাশুনা করার জন্য Peter প্রভৃতি সকলে দশজন লোক নিযুক্ত ক'রেছিলেন। সেইজন্য ইঁহাদিগকে 'Decanus' ('ডিকেনাস্' বা 'দশজন') বল্‌ত। সেই কথাটা অপভ্রংশ হ'য়ে ইংরাজীতে 'Dean' (ডীন্) হ'য়েছে।" আমি হাঁস্‌তে হাঁস্‌তে বল্‌লুম, "কি দম্‌দম্, তুমি কি 'ডিকেনাস্' হ'বে? এবার থেকে তোমাকে 'ডীন্' ব'লে ডাক্‌ব!" এই বলিয়া হাসি তামসা করিতে লাগিলাম।

বদ্রীশা থুল্‌ঘোড়িয়া—

বরানগর মঠের শেষ ভাগে তারকদা পশ্চিমে চলিয়া যান। পশ্চিমে কোন্ কোন্ স্থানে গিয়াছিলেন তাহা আমার বিশেষ স্মরণ নাই; তবে তাঁ'র প্রিয় জায়গা ছিল কাশী ও হরিদ্বার। এইটা মনে আছে যে, এই সময় তিনি আলমোরায় যান এবং সেখানে তাঁহার আলাপী বদ্রীশা থুল্‌ঘোড়িয়ার বাড়ীতে থাকেন। আলমোরার বদ্রীশা থুল্‌ঘোড়িয়া বিশেষ সঙ্গতিপন্ন ব্যাক্তি ছিলেন। অনেকটা বলরাম বাবুর স্বরূপ লোক; খুব ভক্তিমান গৃহী। সাধু সেবা করিতে খুব উৎসাহী। তিনি কাহার কাছে দীক্ষা পাইয়াছিলেন তা' আমি জানি না। বদ্রীশার ছেলে ছিল না; তারকদা'র আশীর্ব্বাদে সন্তান হওয়ায় নাম রাখিয়াছিলেন 'সিদ্ধদাস'। বদ্রীশা তারকদা'কে প্রায়ই চিঠি লিখিতেন। এমন কি ছোট ছেলেটী কি খেলা করছে, কি দুরন্তপানা কাজ করছে তাহাও চিঠিতে লেখা থাকিত। মোট কথা বদ্রীশা তারকদা'র শিষ্য না হইলেও তাঁহার বড় অনুগত ও প্রিয়পাত্র ছিলেন। বদ্রীশা মাঝে মাঝে নানা প্রকার পাহাড়ী ফল পাঠাইয়া দিতেন। এক রকম শুক্‌নো ঘাস কয়েকবার পাঠিয়ে ছিলেন। উহা তরকারীতে দিলে ভুর্‌ভুরে গন্ধ বেরুতো; সেই শুক্‌নো ঘাসগুলি মঠে আসিলে অনেকে কিছু কিছু লইয়া যাইতেন; কারণ এ প্রকার জিনিষ আমাদের বাঙ্গলা দেশে নাই। মোট কথা, বাঙ্গলার বাহিরেও মঠের দুই চারিটী ভক্ত হইতে সুরু হইল। তাঁহাদের মধ্যে বদ্রীশার নাম

বিশেষ উল্লেখ যোগ্য; কারণ সে সময় স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি যাঁহারাই আলমোরায় যাইতেন, তাঁহারা সকলেই বদ্রীশা'র বাড়ীতে থাকিতেন। তিনি মঠের নিতান্ত অন্তরঙ্গ ছিলেন। এই জন্যই তাঁহার নামটা বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিলাম।

ষ্টার্ডী—

এই পর্য্যটনের সময়ে তারকদা'র ষ্টার্ডী নামক জনৈক ইংরাজের সহিত সাক্ষাৎ হয়। এই ষ্টার্ডী তখন তপস্যা করিবার জন্য ভারতবর্ষে আসেন এবং আলমোরাতে একটা বাটী লইয়া কিছু দিন অবস্থান করেন। তারকদা'র ষ্টার্ডীর সহিত বিশেষ সৌহৃদ্য হইয়াছিল। কয়েক মাসের পরিচয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হওয়ায় উভয়ে আলমোরা হইতে মাদ্রাজ যান এবং তাঁহারা সেখানে কিছুদিন ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ যখন লণ্ডনে যান তখন ষ্টার্ডী স্বামীজির বিশেষ সহায়ক হ'য়েছিলেন এবং তিনি তাঁর আত্মগোষ্ঠীর মধ্যে পরিগণিত হন। সম্ভবতঃ ষ্টার্ডী স্বামী বিবেকানন্দের বিষয় তারকদা'র কাছ থেকেই শুনিয়াছিলেন। তারকদা'র এই সময়কার পর্য্যটনের বিশেষ খবর আমার আর জানা নাই।

আলমবাজার মঠ—লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ—

শীতের প্রথমে বরানগর মঠ হইতে আলমবাজার মঠে গমন করা হইল। বোধ হয় কার্ত্তিক মাসের শেষ বা অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমে হইবে। মঠ টেঁকিবে না উঠিয়া যাইবে এই ভাবিয়া

অল্প সংখ্যক লোক ছাড়া মঠে অপর কেহ বিশেষ যাইতেন না। আর সেটাও তত বেশী নয়; কেন না সাধারণতঃ বাগবাজারে বলরাম বাবুর বাড়ীতে পরস্পরের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইত। বরানগর মঠের প্রথম অবস্থায় সকলে মনে করিয়াছিল—গোটাকতক্ স্কুলের ছোঁড়া খাম্‌খেয়ালী ভাবে কি একটা কর্‌ছে; দু'দিন পরে সব উঠে যাবে, আর যে যা'র বাড়ী ফিরে গিয়ে চাকৃরি বাকৃরি কর্‌বে! পরে আলমবাজার মঠের সময় সকলে যখন দেখিল যে, এই ঝড় ঝাপ্‌টার ভিতর দিয়ে, এত দুঃখ কষ্ট সহ্য ক'রে, এই কয়েকটী যুবক অবিচলিত, একচিত্ত ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া রহিল, জগতকে কিছু গ্রাহ্যই করিল না, আর জগতও তা'দের কাছে নরম ও ঋজু হইয়া পড়িল—তখন লোকে মনে করিল যে ইহা একটী চিরস্থায়ী প্রতিষ্ঠান হইবে। তখন মঠ ও সংঙ্ঘের প্রতি অনেক গৃহী ভক্তেরও একটা বিশেষ শ্রদ্ধার আকর্ষণ আসিল। তাঁহারা সকলেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সময়কার নহেন—পরবর্ত্তী সময়ের। যাহাই হউক, মোটামুটি একটা ভাব-স্রোতের পরিবর্ত্তন হইল। আর সাধারণ লোকের ভিতরেও মঠের প্রতি একটা শ্রদ্ধা ও ভক্তির ভাব আসিল। এই সময় অনেক গৃহীভক্ত রবিবার বা ছুটীর দিন মঠে গিয়া থাকিতেন। তাঁহারা সারাদিনটা নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিয়া সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসিতেন। কলিকাতা ও নিকটবর্ত্তী স্থানের লোকের ভিতর মঠের প্রতি প্রথম যেমন একটা বিদ্রূপের ভাব এসেছিল,

এখন তাহা তিরোহিত হইয়া বেশ একটা শ্রদ্ধার ভাব আসিল। এই সময় গিরিশবাবু অবসর পাইলেই মঠে গিয়া সারাদিনটা থাকিতেন। এই সময় একখানা নূতন সতরঞ্চী আসিল; একটী ভাল লম্প আসিল; আর এটা ওটা জিনিষও আসিতে লাগিল। এই সময় বিশেষ ভোগ উপলক্ষে কলিকাতার সব উৎকৃষ্ট জিনিষ আসিয়া পড়িত; কেন না, প্রত্যেক ভক্তই ঠাকুরের জন্য কিছু না কিছু জিনিষ সঙ্গে আনিতেন। শশীমহারাজের এমন নিয়ম ছিল যে, বিশেষ দিনে ঠাকুরের যে ভোগ দেওয়া হইত, তাহা উপস্থিত ভক্তেরা প্রসাদ পাইয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকিত—দৈ, মিষ্ট ইত্যাদি, তাহা তিনি ঘরে রাখিতেন না। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তিনি সমস্ত জিনিষ বিতরণ করিয়া দিতেন। শেষে যে সকল ভক্তেরা উপস্থিত থাকিতেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের সহিত তিনি কিছু কিছু জিনিষ দিয়া ঘর ধুইয়া ফেলিতেন। সঞ্চয়ী ভাবটা তিনি তত পছন্দ করিতেন না।

যাহা হউক, ক্রমে জনসংখ্যা ও ভক্তসংখ্যা বাড়িতে লাগিল। হিন্দুস্থানী সাধু বা পশ্চিম হইতে গৃহী ভক্তেরাও আসিয়া মাঝে মাঝে মঠে থাকিতেন। মোট কথা, কলিকাতায় যে একটা সাধুদের মঠ হইয়াছে এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তেরা যে যেখানে সমাগত হন, এই সংবাদটা পাঞ্জাব পর্য্যন্ত গিয়াছিল। বোম্বাই, আলমোরা প্রভৃতি নানা স্থানেও ইহা প্রচার হইয়াছিল। সকল স্থানের লোকেরাই মঠের সাধু ও সাধকদিগকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি

করিতেন। মঠবাসী সকলের ভিতর এক মন ও এক প্রাণ ছিল। সাধন ভজন করা, পরস্পরের সেবা করা ও পরস্পরকে শ্রদ্ধা দেখান—এইটী মূল মন্ত্র ছিল। গিরিশবাবু মঠে যাইয়া আহারাদি করিবার পর, যদি কেহ তাঁহাকে এক ছিলিম্ তামাক সাজিয়া দিতেন তা' হ'লে তিনি কৌতুক করিয়া বলিতেন, "আরে! সাধুকেই তো সেবা কর্‌তে হয়! আমি সাধুর কাছ থেকেও সেবা নিচ্চি।" এই সময় একটা ভয়ঙ্কর জমাট ভাব আসিয়াছিল। যাঁহারা এই সময় উপস্থিত ছিলেন বা এই সকল ভাব স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাঁহারা ইহা বেশ স্মরণ করিতে পারিবেন—যেন মূর্ত্তিমতী ভালবাসা সেইখানে বিরাজ করিত! মাঝে মাঝে নিস্তব্ধ ভাবটা বদলাইবার জন্য, ছুতো করিয়া খানিকক্ষণ পরস্পরে ঝগড়া করা—তারপর হাসি তামাসা করা! এমন ভালবাসা যে, একজনের গায়ে চিমটী কাটিলে অপর লোক উহু করিয়া উঠিত! এই হইল জীবন্ত প্রাণ! এই হইল তপস্যার প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি! আর এইটাই লাভ করা হচ্চে সাধকের উদ্দেশ্য।

যোগেন মহারাজের দূরদর্শিতা—

যোগেন মহারাজ বলরাম বাবুর বাড়ীর রাস্তার দিকের বারাণ্ডায় পায়চারী করিতে করিতে একদিন বিকালবেলায় আমায় বলিলেন, "তুই তো শালা কেবল বাইবেল পড়িস্? তুই তো শালা ক্রীশ্চান! বল্ দিকিন্, এক কথায় যীশুর

উপদেশের সার মর্ম্ম কি ?" আমি তো কিছুই বুঝ্‌তে পারলুম্ না। যোগেন মহারাজ বল্‌লেন, "দেখ্, যীশু যত কিছু বলেছেন, তা'র সার কথা কি হচ্চে জানিস্ ?—This is my last commandment that ye should love each other well." এই হয় আমার শেষ বাণী—তোমরা পরস্পর পরস্পরকে অন্তরের সহিত ভালবাসিবে। এইটাই হ'ল যীশুর উপদেশের সার মর্ম্ম।

তিনি আর একটী কথা বলিতেন, "Some are born eunuch and some have made themselves eunuch for the Kingdom of Heaven."—কতকলোক নপুংসক হ'য়ে জন্মায় এবং কতকলোক ভগবান্ লাভের জন্য নপুংসক হয় অর্থাৎ ভগবান লাভের জন্য সর্ব্বত্যাগী হয়। আমি তখন বিদ্রূপ ক'রে বল্‌তুম, "যা শালা খোজা গোলাম !" যোগেন মহারাজ ঠাট্টা ক'রে ব'ল্‌তেন, "আরে শালা দেখ্‌বি ! একবার যীশুর সময় কতকগুলো খোজা বেরিয়ে জগতকে আলোড়িত ক'রেছিল, আর এইবার আর একবার কতকগুলো খোজা বেরুবে ! শালা দেখবি, জগতকে তোলপাড় ক'র্‌বে !" আমি তো হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌তুম, "যা শালা খোজা গোলাম !" তখন কিছুমাত্র বুঝ্‌তে পারিনি যে, পরে রামকৃষ্ণ মিশন বলে একটা সঙ্ঘ হ'বে আর এতগুলি ত্যাগী সাধু পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত হ'বে ; কিন্তু যোগেন মহারাজ আগে থাক্‌তে এ কথা ব'লেছিলেন ! ইহাতে যোগেন মহারাজের দূরদর্শিতা বেশ দেখা যাচ্ছে। যাহা হউক, যতদিন পর্য্যন্ত

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ভিতর এই অকপট ভালবাসা, নিস্বার্থ প্রেম, সেবাভাব ও পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ভিতর জীবন্ত প্রাণশক্তি থাকিবে এবং সর্ব্বত্র সঙ্ঘের প্রসারণ হইবে। ইহার ব্যতিক্রম হইলেই অন্য প্রকার হইতে পারে। মোট কথা, বরানগর মঠের ও আলমবাজার মঠের ভাব যেন চিরকাল আদর্শ হইয়া থাকে; তাহা হইলেই সংঙ্ঘের ভূয়সী কল্যাণ হইবে।

মান্দ্রাজ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন—

তারকদা গরমীর সময় মান্দ্রাজ হইতে আসিলেন। তাঁহার পরিধানে কৌপীন ও গৈরিক বসন। গলা থেকে পা পর্য্যন্ত একটা গরদের জামা ও পায়ে মান্দ্রাজী জূতা। তারকদা'র স্বাভাবিক যেমন হাস্য মুখ তেমনি সর্ব্বদাই বালকের মত চিত্ত প্রফুল্ল! কোন বিষয়ে তাঁহার আসক্তি ছিল না। কোনও বিষয়ে বিদ্বেষও নাই আসক্তিও নাই। জগতে তিনি নিরপেক্ষ ভাবে থাকিতেন। নিজের ধ্যান, জ্ঞান ও উচ্চ চিন্তায় সর্ব্বদাই যেন বিভোর। তাঁহার এই সময়কার ভাব ভাষা দিয়া বর্ণনা করা যায় না; কারণ নিরপেক্ষ ও নিঃসঙ্গ ভাবটী যে কি, তাহা প্রত্যক্ষ দর্শন না করিলে সাধকের সে ভাব উদ্ভুত হয় না। He was in the world but not of the world—জগতে তিনি ছিলেন বটে কিন্তু জগত হইতে বিচ্যুত থাকিতেন। এইটাই তাঁ'র

বিশেষ একটী লক্ষণ ছিল। সকলের কাছে যেন একেবারে বিনীত ও নম্র—ঔদ্ধত্য বা কর্কশ ভাব লেশমাত্র নাই। ঠিক্ যেন, "প্রেমময় মূরতি জনচিত্তহারী"। মুখে সব সময় হাসি। বিরক্তির কোনও চিহ্ন নাই। খাওয়া দাওয়া ও কাপড়ের দিকে কোন ভ্রুক্ষেপ নাই। বহির্ব্বাস ও কৌপীন ছিঁড়ে গেছে সে বিষয়ে কোন কিছু প্রকাশ করা নাই। কৌপীনটা ফেটে গেছে তা'তেও কিছু আসে যায় না; কিন্তু চোখ মুখ দেখ্‌লে তিনি যে আনন্দময় পুরুষ তাহা বেশ বোঝা যে'ত। উল্লাসও নেই বিষাদও নেই। এ স্থলে এটা জানা আবশ্যক যে, ধ্যান বা জপ করিতে করিতে কখনও কখনও উল্লাস বা Elation আসিয়া পড়ে এবং তিন চা'র দিন পরে বিষাদ বা Depression আসে। জপ বা ধ্যান করিবার সময় কখনও কখনও বিপরীত বা ভ্রান্ত স্নায়ুর ভিতর শক্তি প্রবেশ করিলে, এইরূপ হঠাৎ একটা উল্লাস বা Elation আসিয়া পড়ে। ইহা হইতেছে অহঙ্কারের অন্য রূপ। কিছু দিন এই অবস্থায় থাকিবার পর, এই উল্লাস বিষাদে পরিণত হয় এবং মনকে নিম্নস্তরে লইয়া যায়। সাধক এই বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন। আনন্দ বা Bliss অন্য প্রকার। ইহা গম্ভীর ও স্নিগ্ধ। ইহাতে ভিতরে একটা সাম্য ভাব আসে এবং হৃদয়ে এক নব প্রকার শক্তি জাগ্রত হয়। বৌদ্ধ গ্রন্থে ইহাকে "গম্ভীরম্" বলিয়াছে। "সাম্যম্" ইত্যাদি বহুপ্রকার শব্দে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। আনন্দ এবং উল্লাস—

দুইটি ভিন্ন বিপরীত বস্তু। একটী হইল সত্য, অপরটী হইল মিথ্যা।

তারকদা যদিও নির্লিপ্ত, অল্পভাষী ও সংযত ছিলেন এবং সকলের সহিত অতি মধুর ভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেন, কিন্তু তাঁ'র মুখে একটা কান্তি বা লাবণ্য ও অতি স্নিগ্ধ গম্ভীর ভাব পরিলক্ষিত হইত। হঠাৎ কেহ যাইয়া তাঁহার সম্মুখে কোন চাপল্য ভাবের কথা কহিতে সাহস করিত না; অথচ, তিনি কোন বিরক্তি বা বিদ্বেষভাবে তাহার দিকে চহিতেন না। সব সময়ে যেন একটা গভীর ধ্যানে নিমগ্ন। কণ্ঠস্বর অতি মিষ্ট। চোখের দৃষ্টি অতি স্নেহপূর্ণ ও স্থির। বাক্ সংযত এবং মুখে যেন হাসি ও আনন্দ বেশ ফুটে রয়েছে। নির্লিপ্ত লোক—জগৎ বা শরীরের উপর কোন আস্থা নাই—তাহার সহিত কোন সম্পর্কও নাই। ভবিষ্যতে, সাধকেরা তারকদা'র এই চেতন-সমাধি মূর্ত্তি বা গভীর ধ্যানমগ্ন মূর্ত্তিটী বিশেষ করিয়া উপলব্ধি করিতে পারিবেন, এই আশায় এই সকল লক্ষণ এখানে বর্ণনা করিলাম। এই সময়ে তিনি যে উচ্চমার্গের ধ্যানী ও সাধক ছিলেন তা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইত। পরস্পর যে যেমন হাসি তামাসা করুক না কেন তারকদা'কে সকলেই সম্মান করিত ও সংযত ভাবে কথা কহিত। তিনি নিজে ইচ্ছা করিয়া হাসি তামাসায় যোগ না দিলে তাঁহার সহিত কেউ হাসি তামাসা করিত না। কঠোর তপস্যা করিয়া তিনি যে কিছু উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং অন্তরে যে বেশ

শান্তি পাইয়াছিলেন তাঁহাকে দেখিয়া ইহা বেশ স্পষ্ট বুঝা যাইত। Sweet Shivananda became sweeter all the more —তিনি মধুর হইতে মধুরতর হইলেন।

জামা ও মান্দ্রাজী জুতাচুরি –

তারকদা মান্দ্রাজ হইতে আসিয়া অভিবাদন ও প্রণামাদি করিবার পর একটু স্থির হইয়া বসিলে, তাঁ'র গায়ের রেশমের লম্বা জামাটা বাহিরের উঠানের দিকের গরাদের উপর (অর্থাৎ বড় ঘরের সুমুখের বারাণ্ডায়) শুকুতে দেওয়া হ'ল; আর জুতাটী তেতালা ছাদে উঠিবার সিঁড়ির কাছে রাখা হ'ল। তারকদা তামাক খেতে লাগ্‌লেন। আমি ও সান্ন্যাল মশায় (শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল) বারাণ্ডায় ঠেস দিয়ে পাশাপাশি ব'সেছিলুম্। আমি বল্‌লুম, "তারকদা, নোটীশ দিচ্চি, তোমার চটীজুতা চুরী যাবে! আগে থেকে আমি ব'লে রাখ্‌ছি!" সান্ন্যাল মশায় হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন, "তারকদা, আমিও নোটীশ দিচ্চি, জামা চুরি যাবে! তখন আর খোঁজা খুঁজি ক'র না।" তারকদা হাস্‌তে হাস্‌তে হর্ষ-কোপে বল্‌তে লাগ্‌লেন, "আরে! তোমরা তো বড় বেয়াড়া লোক! জামাটা জুতাটা পর্য্যন্ত চুরি ক'র্‌বে সব? দেখ দিকিনি, আমার আর কিছু নেই যে! এই একজোড়া মাত্র জুতা আছে!" আমরা বল্‌লুম, "সে না হয় পরে হ'বে, এখন কিন্তু তোমার জিনিষ চুরি যাবে।" তারকদা

হাস্‌তে হাস্‌তে অনেকক্ষণ কৌতুকচ্ছলে ঝগড়া কর্‌লেন ও হাত নাড়্‌তে লাগ্‌লেন। বিকালে আস্‌বার সময় আমি জূতাটা নিলুম এবং সান্ন্যাল মশায় গরদের জামাটা নিয়ে চ'লে এলেন।

গিরিশবাবু এই সময়ে তাঁ'র ছোট ছেলেটার জন্য ৺তারকেশ্বরে নখ ও চুল মেনেছিলেন। পায়ের নখগুলো বড় হওয়ায় সাধারণ জুতা পায়ে দিতে পারছিলেন না। একদিন বিকালে গিরিশবাবুর বাড়ীতে বসিয়া আছি এমন সময় গিরিশবাবু বল্‌তে লাগ্‌লেন, "পায়ের নখগুলো বড় হ'য়েছে। জুতা পায়ে দিতে পার্‌ছি না। একটা মান্দ্রাজী কসমের জুতা হয় তো তা হ'লে আঙ্গুলগুলো বেরিয়ে থাকে, পায়ে আর লাগে না!" আমি হঠাৎ বল্‌লুম, "তারকদা'র একজোড়া জুতা আমি নিয়ে এসেছি; যদি সেটা চলে তো কাল দিয়ে যাব।" তার পরদিন আমি জুতা জোড়া গিরিশ-বাবুকে দিয়ে এলুম। তখনকার দিনে, মান্দ্রাজী জুতা কল্‌কাতায় চলন ছিল না। এই উপাখ্যান দিবার এইমাত্র কারণ যে, তখনকার দিনে, পরস্পরের প্রতি কি একটা অকপট ভালবাসা ও স্নেহ ছিল; সকলেই কিরূপ এক মন ও এক প্রাণ, কোনও বিষয়ে যে প্রাধান্য, পার্থক্য বা বিভিন্নতা কিছুই ছিল না—ইহাই দেখাবার জন্য। মোট কথা,—তখন ভালবাসার একটা অদ্ভুত রাজত্ব চ'লেছিল। এ সকল বিষয় ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। ইহা প্রত্যক্ষ জীবন্ত ভালবাসা। দ্বিধা, সঙ্কোচ,

উঁচু ও নীচু ভাব এ সব কিছুই ছিল না। ভালবাসার জন্যই ভালবাসা।

টমাস ক্রীশ্চান সম্প্রদায়—

আলমবাজার মঠে তারকদা একদিন টমাস ক্রীশ্চান (Thomas Christian) নামক একটী ক্রীশ্চান সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "এই সকল ক্রীশ্চানরা হিন্দুর আচার রাখিয়া থাকে—কপালে তিলক ও গলায় পৈতাও থাকে। ইহারা যীশুর শিষ্য Thomas'এর শিষ্যমণ্ডলী।" শরৎ মহারাজ শুনিয়া অনেক চিন্তার পর বলিলেন, "সম্ভবতঃ কোনও যীশুইট্ (Jesuit) পাদ্রী আসিয়া এই সকল লোককে ক্রীশ্চান করিয়াছিলেন। ইহারা যীশুর শিষ্য টমাসের সম্প্রদায়ভুক্ত নহে।" আমি পরিশেষে স্পেন্স্ হার্ডি (Spence Hardy) লিখিত পুস্তক ও অপর সকল গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া জানিলাম যে যীশুর শিষ্য টমাস ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন এবং এদেশে তাঁহার কিছু শিষ্যও হইয়াছিল। প্রত্যাবর্ত্তন কালে পাঞ্জাব বা আফগান দেশের মধ্যস্থিত কোন স্থানে টমাসের মৃত্যু হয়। প্রচলিত ক্রীশ্চান সম্প্রদায় হইতে এই টমাস সম্প্রদায় স্বতন্ত্র।

আলমবাজার মঠের কিঞ্চিৎ অবস্থার পরিবর্ত্তন—

শেষভাগে বরানগর মঠের অবস্থা অনেকটা স্বচ্ছল হ'য়ে-

ছিল। চাল, ডাল, আটা এগুলো এসে যেতো; এমন কি তরকারীও বাজার থেকে কেনা হ'ত। আলমবাজার মঠ প্রথম হ'লে অবস্থা আর একটু ভাল হ'ল। সেই সময় খাবার চালটা খুব ভাল দেখে কেনা হ'ত। একটা ডাল, একটা তরকারী এবং একটা অম্বল রান্না হ'ত। রাত্রে সাধারণের জন্য রুটী, একটা তরকারী এবং কখন কখন ডালও হ'ত। আমার যতদূর মনে আছে, ঠাকুরের ভোগের জন্য রাত্রে লুচি ও সন্দেশ হ'ত। রাঁধ্‌বার রসুইয়ে ও জল তোল্‌বার ভারী পূর্ব্বের মতনই ছিল।

একদিন গরমীকাল বিকালবেলা, ঠাকুরের ভাঁড়ারের সম্মুখে —পূর্ব্বদিকে খোলা ছাদের কোণটাতে, শশী মহারাজ একটা বঁটী নিয়ে কুট্‌নো কুট্‌ছেন। সান্যাল মহাশয়ও একটা বঁটী নিয়ে কি কর্‌ছেন। আরও কয়েকজন কুট্‌নোর ধামার কাছে ব'সে আছেন। খোলা ছাদে, ঠাকুরের ভাঁড়ারের দেওয়ালের কাছে বাবুরাম মহারাজ একটা পীঁড়িতে আলপনা দিচ্চেন্। আমি বল্লুম, "হ্যাঁ গা, পীঁড়িতে আলপনা দিচ্চো কেন গা?" বাবুরাম মহারাজ বল্লেন, "কি একটা পূজা হবে!" কারণ শশী মহারাজ অনেক খুটিনাটি পূজা কর্‌তেন—তা অত মনে রাখা যায় না। আমি খোলা ছাদটার মাঝ-খানে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ চেয়ে দেখ্‌লুম। দেখে বল্‌তে লাগলুম,—

"মিন্সেরা সব কুট্‌নো কুট্‌বি,
বাট্‌না বাট্‌বি পীঁড়েয় দিবি আলপনা।
মেয়েরা সব কলেজ যাবে,
Knowledge পাবে কর্‌বে সাধের বাবুয়ানা॥"

এই শুনে সকলেই হেসে উঠলেন। শশী মহারাজ কুট্‌নো কুট্‌তে কুট্‌তে রেগে মুখ ফিরিয়ে বল্‌তে লাগ্‌লেন, "তুই ছোঁড়া বড় ঠাট্টা করিস্! তোর ঠাট্টার চোটে অস্থির হ'য়ে পড়ি!" আমি হাস্‌তে হাস্‌তে বার বার ঐ কথাই বল্‌তে লাগ্‌লুম। এইতো সকলের ভিতর একটা হাসি ও ঝগড়া উঠ্‌ল! শশী মহারাজ বল্‌তে লাগ্‌লেন, "আমরা নিজেরা না ক'র্‌লে চল্‌বে কেন? তুই ঠাট্টা ক'র্‌লে হবে কি?" এই-রূপে খানিকক্ষণ হাসি তামাসা চ'ল্‌ল।

রুটী সেঁকা ও পায়খানা পরিষ্কার করা—

বরানগর মঠ স্থাপনের অল্প কয়েকমাস পরেই অর্থাৎ এক বৎসরের ভিতরেই তুলসী মহারাজ (স্বামী নির্ম্মলানন্দ) আসেন। তিনি তখন যুবা, কৃশ ও দৃঢ়কায় শরীরবিশিষ্ট, অতি মিষ্টভাষী, সর্ব্বদা হাসি মুখ ও অক্লান্ত পরিশ্রমী। তিনি শশী মহারাজের একরূপ ডান হাত হইয়া রহিলেন। কি হাণ্ডা মাজা, কি পুকুর থেকে জল আনা—যে কাজই হোক না কেন তুলসী মহারাজ আগুয়ান হইয়া করিতেন। রাত্রে অনেক সময়

তিনি রুটী সেঁকিতেন। এই রুটী সেঁকার কথা বড় আনন্দ-দায়ক। দু' তিন জন লোক ময়দা মাখ্‌ছে ও বেল্‌ছে। একটা কেরোসিন তেলের টিনের উপর একজন বসেছে, উনুনে এক একখানা ক'রে রুটী সেঁকছে এবং যে যখন খেতে' বস্‌ছে তা'কে গরম গরম রুটী এক একখানা ক'রে দিচ্চে আর মুখে নানা রকম উচ্চ অঙ্গের চর্চ্চাও চল্‌ছে। সে রুটী সেঁকা ও রান্নাঘরে গিয়ে জড় হওয়া বড় আনন্দের জিনিষ ছিল। হাতেতেও যেমন সকলে কাজ কর্‌ছে, মুখেতেও তেমনি সৎ চর্চ্চা ও সৎ আলোচনা চল্‌ছে। সে ভারি এক স্ফূর্ত্তির ব্যাপার ছিল। তরকারী যাই হো'ক না কেন—গরম রুটী, নুন, লঙ্কা আর এই সৎ চর্চ্চা ও মাঝে মাঝে খুব হাসি তামাসা থাকায়, এই রুটী খাওয়া মহা আনন্দের জিনিষ ছিল। মোট কথা, ইহাই বুঝা আবশ্যক যে, এই কঠোর সাধনা, অনাহার ও অনিদ্রা কাহারও মনে কোন কষ্ট বা দুঃখের কারণ বলিয়া বোধ হইত না। একটা আনন্দ ও হাসি তামাসার ভিতর দিয়া যেন সমস্ত জীবনস্রোত চলিত। গোম্‌ড়া মুখ, বিষণ্ণ ভাব, রুক্ষ ভাব—এ সব কিছুই ছিল না। হাস্যকৌতুকের ভিতর দিয়া মহা কঠোর ও দুঃসাধ্য সাধনা চলিয়াছিল। এইজন্য, এই কঠোর সাধনা কেহ কষ্ট বলিয়া মনে করে নাই। আলম-বাজার মঠেতে শশী মহারাজ এবং তুলসী মহারাজ দু'জনেই যেন মঠের অধ্যক্ষ হইলেন। এই দু'জনেই সমস্ত দেখাশুনা

করিতেন। এই কয়েক বৎসর তুলসী মহারাজের জীবন একদিকে যেমন কষ্টকর ছিল, অপরদিকে তেমনি আনন্দময় হইয়াছিল। এইটীই পক্ষান্তরে তাঁ'র প্রথম জীবনের শ্রেষ্ঠ অবস্থা। একদিকে নিজের জপ ধ্যান করিতেছেন আবার অবসর পাইলেই পড়াশুনা করিতেছেন। কার্য্যের দিকেও তিনি তেমনি তৎপর ছিলেন। আবশ্যক হইলে ঘরদুয়ার সব ঝাঁট দিতেছেন এবং বাজারে গিয়া একটা ঝুলি করিয়া আনাজ তরকারীও কিনিয়া আনিতেছেন। আলমবাজারের বুড়ীর কাছ থেকে টিকে কিনিয়া, ঝোড়াটা নিজে কাঁধে করিয়া লইয়া আসিতেন; আবার এদিকে সমস্ত বাসন, হাণ্ডা চট্‌পট্‌ করিয়া মাজিয়া ফেলিতেন—অবশ্য অপরেও তাঁ'র সঙ্গে কখনও কখনও এই কাজ করিতেন। তাঁহার এই অদ্ভুত কার্য্যের দৃশ্য এখনও আমার চোখের উপর রহিয়াছে। ভিতরকার বাড়ীর খিড়কীর দিকে একটা পুকুর ছিল। তুলসী মহারাজ এক কলসী জল কাঁধে আর এক কলসী জল হাতে লইয়া, সমস্ত নীচের বাড়ীটা মাড়িয়ে, সিঁড়ি দিয়ে উঠে, উপরকার খোলা ছাদের দক্ষিণ দিকের যে পায়খানাটা—সেইটী ধুইয়া ফেলিতেন (প্রণাম করি! প্রণাম করি! প্রণাম করি!) এবং বড় বড় মাটীর গামলাতে জল ভ'রে রাখ্‌তেন। জল তুলে তুলে তাঁ'র বাঁদিকের কাঁধেতে একটা দাগ প'ড়ে গিছ্‌লো! আবার এর ভিতরেও তিনি রান্না ঘরের কাজ করিতেন, কুট্‌নো

কুটিতেন। আবশ্যক হ'লে এদিকে রুগীরও সেবা করিতেন। বিরক্তির বা ক্লান্তির ভাব তাঁ'তে একবারে ছিল না—সব সময়েই হাস্য মুখ। বাস্তবিক, তুলসী মহারাজ নিজের শরীরের রক্ত জল করিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং বরানগর মঠ ও আলমবাজা'র মঠ সংঘটন ও একীভূত করিবার তিনি একজন বিশেষ সহায়ক ছিলেন। এইকালে, অপর সকলের তপস্যার বলে যেমন মঠের শক্তি সঞ্চয় হইয়াছিল, তেমনি তুলসী মহারাজের তপস্যা ও সেবার বলেও মঠ অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছিল।

শ্রদ্ধা —

বরানগর মঠ ও আলমবাজার মঠে সকলের ভিতর একটা শ্রদ্ধার ভাব ছিল। সকলে ধর্ম্মতত্ত্ব অধিকতর বুঝিবার ও জানিবার জন্য পরস্পরের মধ্যে নানাবিধ তর্ক ও আলোচনা করিতেন। এমন কি কখনও কখনও উভয় পক্ষ উত্তেজিতও হইতেন; কিন্তু সেটা শুধু শিখিবার ও জানিবার উদ্দেশ্যে। এই তর্ক ও আলোচনার ভিতর কি একটা ভালবাসার ভাব থাকিত—পরাস্ত করা বা জয়লাভ উদ্দেশ্য নয়, নিজের প্রধান্য বা পাণ্ডিত্য দেখাইবারও উদ্দেশ্য নয়; কিন্তু নিজে জপ ধ্যান করিয়া এবং পুস্তকাদি পড়িয়া যা কিছু অর্জ্জন করিয়াছেন বা জানিয়াছেন তাহা সত্য বা ভ্রান্ত এইটী অপরের সহিত মিলাইয়া দেখিবার জন্য এইরূপ করিতেন। কেহ কাহারও মর্য্যাদার হানি করিতেন না;

অথচ নিজ পক্ষ সমর্থনের জন্য বেশ দৃঢ়তার সহিত তর্ক বিতর্ক করিতেন। এইরূপ শ্রদ্ধাপূর্ণ তর্ক বিতর্ক প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। অহঙ্কার বিবর্জ্জিত ভাব, অথচ দীনহীন ভাবও নয়—বেশ তেজোপূর্ণ, প্রেমপূর্ণ ভাব ; নিজের নিতান্ত আত্মজন—এই ভাবেতে পরস্পরেতে কথাবার্ত্তা চলিত। এইস্থলে ইহা বিশেষ করিয়া জানা আবশ্যক যে, গুরুগিরি বা মাতব্বরী ভাব কিছুই ছিল না। সকলেই সমান—সকলেই এক। তবে তপস্যা বা সাধনে কেহ অপর হইতে বেশী উন্নত হইয়াছেন, কেহ এখনও ততটা পারেন নাই—উচ্চস্থানে পৌঁছাইবার জন্য বিশেষ প্রয়াস করিতেছেন। এইরূপ শ্রদ্ধার ভিতর দিয়া, এইরূপ অকপট ভালবাসার ভিতর দিয়া, বরানগর ও আলমবাজার মঠের কঠোর তপস্যা সংসাধিত হইয়াছিল। এই জিনিষ যাঁহারা না দেখিয়াছেন বা অনুভব করিয়াছেন, তাঁহাদের কাছে বাক্য বা ভাষা দিয়া ইহা বর্ণনা করা যায় না।

এ স্থলে একটী কথা বলা আবশ্যক যে, ভক্তিতে একটা সংযত ভাব থাকে—উচ্চ নীচ, শ্রেষ্ঠ ও লঘু, একটা সঙ্কোচ ও ভয়ের ভাব থাকে—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি পাছে কোন বিষয়ে অসন্তুষ্ট হন। শ্রদ্ধাতে এইরকম সঙ্কোচের ভাব নাই। সকলেই উচ্চ আদর্শের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। এই জন্য শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে।

আর একটা কথা এস্থলে বলা আবশ্যক যে, মঠের

সকলের ভিতর আনন্দের ভাব ছিল। ইহা উল্লাসের (Elation) ভাব নয়; কারণ উল্লাস হইতেছে চাপল্যের ভাব। এইটা হইতেছে গম্ভীর, স্নিগ্ধ, স্থির ভাব—আজ্ঞাপ্রদ, স্তব্ধায়মান ভাব (Hushing commanding voice.) ইহার উৎপত্তি নির্ণয় করিতে হইলে এই কথা বলা যায়—দ্রষ্টা ও দ্রষ্টব্যের মধ্যে নিরন্তর ব্যবচ্ছেদ থাকে; এই পার্থক্য নিবন্ধন দ্রষ্টব্য কখনও উচ্চ কখনও বা নিম্ন হয়। ইষ্টজ্ঞানে দ্রষ্টব্য উচ্চ অবস্থায় অবস্থান করে বলিয়া বিবেচিত হয় এবং দ্রষ্টাকে নিম্নস্থানীয় বলিয়া বোধ হয়। এইজন্য ইহাতে দ্বিধা ও সঙ্কোচ ইত্যাদির ভাব থাকে। ইহা ভক্তি হইতে পারে, কিন্তু আনন্দ (Bliss) নহে। আনন্দ হইতেছে—দ্রষ্টা আর দ্রষ্টব্য, অহং ও ইষ্টম্ যখন একীভূত হইয়া যায়—ব্যবচ্ছেদ বিলুপ্ত হইল ! ইহাকেই বলে আনন্দ। বৈষ্ণব ভাষায় বলিতে হইলে এই কয়েকটী লক্ষণ নির্দ্দেশ করা যায়, যথা—সামীপ্য, সালোক্য, সাযুজ্য, সারূপ্য সাধিষ্ঠ, সার্ষ্টি। যাঁহারা বৈষ্ণব শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহারা এই বিষয়টী বিশেষ করিয়া বুঝিতে পারিবেন।

যাহা হউক, আলমবাজার মঠে পরস্পরের প্রতি কি গভীর শ্রদ্ধার ভাব ছিল! ঘরের ভিতর কেহ পড়িতেছেন, কেহ বা জপ-ধ্যান করিতেছেন—পাছে তাঁহার কোন ব্যাঘাত হয় এইজন্য অপর সকলে সংযত পদবিক্ষেপে যাতায়াত করিতেন। মোট কথা, প্রত্যেক লোক অপরকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষুদ্র

প্রতিকৃতি বা অনুরূপ মনে করিতেন এবং সেইভাবে সেবা ও শ্রদ্ধা করিতেন। এই সময় কে কা'র চেয়ে উঁচু বা নীচু এ বিষয় বিচার্য্য ছিল না—সমষ্টি ও সঙ্ঘটাই এক অদ্ভুত জীবন্ত প্রাণবন্ত ব্যক্তি-পুঞ্জ ছিল। ভগবান্ বুদ্ধ বলিয়াছেন—বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ—এই তিনটীকেই সমান মানিবে। "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি"—এই মন্ত্র বুদ্ধের সঙ্ঘের অন্তর্গত সকলেই প্রত্যেক ধর্ম্মসংক্রান্ত ব্যাপারের প্রারম্ভে তিনবার করিয়া উচ্চারণ করিয়া থাকেন। বরানগর ও আলমবাজার মঠে এই ভাবটা বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল।

হৃদু মুখুজ্জ্যের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় আনন্দ—

উচ্চমার্গের সাধকের মনোবৃত্তি ও তাঁ'র তপস্যার নানাস্তরের বিষয় বর্ণনা করা অতীব দুরূহ; কারণ এই তপস্যার কালে কেহই নিজ মনোভাব প্রকাশ করিয়া বলেন না। নিজের ভাবেই নিজেই তন্ময় হইয়া থাকেন এবং বাহ্য জগতের সহিত বিশেষ কোন সম্পর্ক রাখেন না। তবে আভাষ, ইঙ্গিত, মুখের লাবণ্য, চক্ষের দৃষ্টি ও কণ্ঠস্বর দিয়া তাঁহাদের মনোগত ভাব কিঞ্চিৎ পরিমাণে প্রকাশ পায়। এইজন্য শিবানন্দ স্বামীর তপস্যাকালের ভাব সমূহ বিশেষ কিছুই বলিতে পারিলাম না। কেবলমাত্র গুটিকতক উদাহরণ দিয়া আভাষাদিতে তাঁহার মনোভাব প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছি।

গরমীকাল, একদিন সকালবেলা হৃদু মুখুজ্জ্যে তা'র কাপড়ের গাঁট্‌রি রাখিয়া ঠাকুরঘরে আসিয়া প্রণাম করিল এবং তারকদা'র কাছে তামাক খাইবার জন্য আসিয়া বসিল। তারকদা তখন খোলা ছাদে, দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের বড় বারাণ্ডায় বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন। আমিও কাছে আসিয়া বসিলাম। তারকদা হৃদু মুখুজ্জ্যেকে হুঁকাটা দিলেন। পরমহংস মশায় কেশববাবুর বাড়ীতে কিরূপভাবে গিয়াছিলেন এবং সেখানে কি কথাবার্ত্তা হইয়াছিল সে বিষয় কথা উঠিল। হৃদু মুখুজ্জ্যে অতি স্পষ্টদৃষ্ট ভাবে সমস্ত কথা বর্ণনা করিতে লাগিল। কেশববাবুর বাড়ীর কথা অনেকেরই জানা ছিল না। সকলেই হৃদু মুখুজ্জ্যের কাছে তাহা নূতন শুনিতে লাগিল। হৃদু মুখুজ্জ্যে কথা বলিতে বলিতে এমন উত্তেজিত হইল যে, সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া কোঁচাটা মাথায় ঘোমটার মতন দিয়া "দূতী সংবাদ" কীর্ত্তন করিতে লাগিল। পরমহংস মশায় কেশব সেনের বাড়ীতে গিয়া যে "দূতী সংবাদটী" গান ক'রেছিলেন হৃদু মুখুজ্জ্যে সেই গানটী গাহিতে লাগিল। এখন আমার সেই গানটী স্মরণ নাই। ক্রমে আরও ডু'এক জন আসিয়া যোগ দিল। কথাগুলো খুব জমিয়া গেল এবং শশীমহারাজ, নিরঞ্জন মহারাজ ও আমি হৃদু মুখুজ্জ্যেকে অনেক পূর্ব্বকথা প্রশ্ন করিতে লাগিলাম। কথা-বার্ত্তায় দেখিলাম যে, হৃদু মুখুজ্জ্যের একটা আচ্ছন্ন ভাব আসিয়াছিল। নিজেকে সে হীন ও জগতের পরিত্যক্ত বলিয়া

মনে করিত; কিন্তু পরমহংস মশায়ের পূর্ব্বতন কথা উঠিতে হুতু মখুজ্যের সেই মোহটা কাটিয়া গেল এবং সহজ অবস্থায় আসিয়া বেশ তেজঃপূর্ণ ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। যাহা হউক, সেই দিন একটা বেশ জমাট ভাব হ'য়েছিল এবং সকলেই তন্ময় হইয়া হুতুর কথা শুনিতে লাগিল। তারকদা ধীর ও গম্ভীর প্রকৃতির লোক। ভাবগুলিকে পরের পর সাজাইয়া খুব উচ্চ অবস্থায় তুলিলেন। যদিও এই ঘটনাটী সামান্য কিন্তু উচ্চমার্গের প্রসঙ্গ উঠিলে সাধকের প্রাণ কিরূপ আনন্দিত ও উল্লাসিত হইয়া উঠে ইহাতে তাহা বেশ বুঝা যায়।

মহাধ্যানী — শুষ্ক প্রাণ নহে —

তারকদা যদিও ধীর, শান্তপ্রকৃতি ও মহাধ্যানী ছিলেন কিন্তু তিনি শুষ্ক প্রাণ ছিলেন না। তিনি নীরস গোম্‌ড়ামুখো সাধু ছিলেন না। হাসি, তামাসা, ঠাট্টা তাঁ'র সর্ব্বদাই থাকিত— যাহাকে বলে স্ফূর্ত্তিবাজ সাধু—নানা রকম ব্যঙ্গ ক'রে লোককে হাসাতে পার্‌তেন। তবে তাঁ'র হাসি ও ঠাট্টা তামাসাতে কোন বিরক্তির ভাব ছিল না।

চৈত্রমাসে, আলমবাজারের রাস্তা দিয়ে ঢোল বাজিয়ে কতকগুলি গাজনের সন্ন্যাসী যাচ্ছিল। এই দেখেই তারকদা'র বাল্যকালের স্মৃতি জেগে উঠ্‌ল। তিনি বাইরের বড় ঘরটাতে থাকিয়াই গাজনের সন্ন্যাসীর ছড়া আরম্ভ ক'র্‌লেন। গাজনের

সন্ন্যাসীর ছড়া তাঁ'র অনেক মুখস্থ ছিল এবং "উতোর" (উত্তর) ও "চাপান" (প্রশ্ন সমাধানের ভারার্পণ) উভয়ই তাঁ'র কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি বল্‌তে লাগ্‌লেন, "একটা খাতাতে আমরা ছেলেবেলায় প্রশ্ন লিখে রেখে দিতুম। গাজনের সন্ন্যাসী আস্‌ছে দেখ্‌লেই আমরা রাস্তায় গিয়ে একটা দাগ কেটে দিতুম। দাগ দিয়েই সন্ন্যাসীদের ছড়া ক'রে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতুম। ছড়ার উত্তর না দিয়ে দাগ বা গণ্ডী পার হ'তে নাই। যদি "উতোর" দিতে না পার্‌ত তা হ'লে তা'রা পিছনকার দিকের পথে ফিরে যেতো। আমরা তাড়াতাড়ি গিয়ে সে দিকেও একটা দাগ কেটে দাঁড়াতুম্। সন্ন্যাসীরা আট্‌কা প'ড়লো, আর বেরুতে পারতো না! তখন কাকুতি মিনতি ক'র্‌লে আমরা গণ্ডী মুছে দিতুম্। তখন সন্ন্যাসীরা চ'লে যে'তো।" এই ব'লে তারকদা গাজনের সন্ন্যাসীদের ছড়া আওড়াতে লাগ্‌লেন। তখন তাঁ'র খুব স্ফূর্ত্তির ভাব, যেন পুনরায় বালক হ'য়েছেন এবং হাত নেড়ে নেড়ে, নানা ভঙ্গী ক'রে ছড়া আওড়াতে লাগ্‌লেন। তিনি সে দিন আনন্দেতে পরিপূর্ণ হ'য়েছিলেন। স্ফূর্ত্তি আর হাসির কথা কি ব'ল্‌বো!

একদিন দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়া হ'য়েছে—অর্থাৎ ১১।১১৷৷ টার সময় একটী বাবু এলেন। চোখে সোণার চশমা, গায়ে কাল আলপাকার কোট, বুকে ঘড়ী ঘড়ীর চেন, হাতে একটী

চামড়ার কুরিয়ার ব্যাগ (Courrier bag)। এই ব্যাগ চামড়ার ফিতে দিয়ে গলায় ঝোলান যেতো—তখন প্রচলন ছিল। বাবুটী বাড়ীর ভিতর পশ্চিম-দক্ষিণ বারাণ্ডাটার দিকে চেয়ে দাঁড়ালেন। পরে তাঁর 'সমাধি খেলা' দেখাতে ইচ্ছা ক'র্‌লে তারকদা, গুপ্ত মহারাজ, শশী মহারাজ, আমি ও আরও কয়েকজন সেখানে উপস্থিত হলুম। বাবুটী গুপ্ত মহারাজের হাতে ব্যাগটী দিলেন। দিয়াই সুরু ক'র্‌লেন, "ও গুপ্ত! আমার চশমাটা ধর্! আমার সমাধি আস্‌ছে!" এই ব'লে গুপ্ত মহারাজের হাতে চশমাটা দিয়ে হাত ছুটো বেঁকিয়ে সমাধিপ্রাপ্ত হ'লেন। মাঝে মাঝে শুধু "বুরুর্, বুরুর্, বুরুর্" ক'রে আওয়াজ ক'র্‌তে লাগ্‌লেন। বাবুটী সমাধি অবস্থায় পাছে প'ড়ে যান, এইজন্য গুপ্ত মহারাজ ব্যঙ্গচ্ছলে পিছন দিকে ছুই হাত প্রসারণ ক'রে রাখ্‌লেন। তারপর, মিনিট ছু'য়েক সমাধি টান্‌বার পর তাঁ'র খেলা ফুরিয়ে গেল। তখন তিনি চশমাটা আবার চোখে দিয়ে ব্যাগটী নিলেন। অবশ্য ব্যাগ থেকে কেউ কিছু নিয়েছেন কিনা সেটা জান্‌বার জন্য ব্যাগটা খুলে সব দেখে নিলেন! তারপর একটা প্রণাম ক'রে বল্লেন্, "খেয়া নৌকায় পার হ'য়ে বালীতে যেতে হ'বে। হুগলীতে একটা কাজ আছে।" সমাধিপ্রাপ্ত লোকটী চ'লে গেলে পর, তারকদা'র এক নূতন প্রকার হাসি কৌতুকের বিষয় জুটিল। যখন তাঁ'র স্ফূর্ত্তি হইত—তখন তিনি ব'লে

উঠ্‌তেন, "ও গুপ্ত! আমার চশমাটা ধর্! আমার সমাধি আস্‌ছে!" আর গুপ্ত মহারাজও অমনি পিছনদিকে হাত ছড়িয়ে দাঁড়াতেন। তারকদা খানিকক্ষণ মুখে "বুরুর্! বুরুর্! বুরুর্!" ক'রে আওয়াজ ক'র্‌তেন। এইরূপ হাসি ও কৌতুক দিন কতক খুব চ'লেছিল।

একদিন শনিবার, আড়াইটা বা তিনটার সময় কিশোরীদা (শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন রায়) আফিসের ফের্‌তা বাইরের বড় ঘরটীতে এলেন। তাঁর বাড়ী বন-হুগলী—মঠের সন্নিকট। কিশোরীদা ভারি নকুলে। তিনি কাব্‌লীভাষায় অর্থাৎ "পস্তু" ভাষায় (যাকে তিনি 'পোস্ত' ভাষা বলেন!) অবিকল লেক্‌চার ক'রে যেতে পারেন। দূর থেকে শুন্‌লে বোধ হ'বে যেন তিনি "পোস্ত" ভাষায় কতই লেক্‌চার দিচ্চেন্। কিশোরীদা বড় ঘরের দরজায় এসেই "পোস্ত" ভাষায় প্রথম লেক্‌চার স্থুরু ক'র্‌লেন। তারকদাও অমনি গুজরাটী ভাষাতে (যা'কে তামাসা ক'রে "কেঁইয়া" ভাষা বলা হ'ত) হাত নেড়ে, মাথা নেড়ে লেক্‌চার স্থুরু ক'র্‌লেন। কিশোরীদাও অমনি "পোস্ত" ভাষা ছেড়ে "কেঁইয়া" ভাষাতে লেক্‌চার স্থুরু ক'র্‌লেন। এই দু'জনের লেক্‌চার স্থুরু! সে লেক্‌চারের ধমক্ কি! কতই না মুখ নাড়া, কতই না হাত নাড়া, কতই না মাথা নাড়া ও কতই না রাগের গলা করা! সে এক ভীষণ ব্যাপার হ'য়ে উঠ্‌ল! তারপর আমি বল্‌লুম, "তোমাদের এই লেকচারের অর্থটা কি হ'ল?"

তারকদা হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন, "আমি কিশোরীকে বল্‌লুম—একং ছিলিম তামাক খাইয়ে যা!" আমি তখন হাস্‌তে হাস্‌তে ফের বল্‌লুম "বাবা! এক ছিলিম তামাকের জন্য এত বিদ্যেটা খরচ? বল্লে'ত আমিই সেজে দিতুম?" দুজনকার সে লেক্‌চার এমন সুন্দর হ'য়েছিল যে, দূর থেকে শুনে বোধ হ'য়েছিল যেন দু'জন ভাটিয়া কারবারী পরস্পরের মধ্যে মালের দামের দরুণ ক্রুদ্ধ হ'য়ে কথাবার্ত্তা কইছে।

যাহো'ক তারকদা'র অনুকরণ কর্‌বার ক্ষমতাটা বেশ ছিল। তিনি বেশ হাসাতে পার্‌তেন। প্রত্যেক বিষয়টী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেওয়ার আবশ্যক নেই; এই ভেবে বিস্তৃত বিবরণ পরিত্যাগ ক'র্‌লুম। এইমাত্র এখানে দেখান উদ্দেশ্য যে, এমন উচ্চমার্গের সাধক হ'য়েও এবং সতত গম্ভীর ও বিভোর থেকেও তিনি মাঝে মাঝে হাসি কৌতুকও কর্‌তে পারতেন। তিনি মহাধ্যানী হ'য়েও শুষ্ক প্রাণ ছিলেন না।

পুত্রশোকা বসন্ত'র মার কথা—

বর্ষাকাল, বরানগর মঠে একটী হিন্দুস্থানী বাঙ্গালী ছোক্‌রা আসিল—নাম বসন্ত। সে ভাল বাংলা বুঝিত না। কানেও একটু কালা ছিল। গুপ্তমহারাজ জৌনপুরের লোক। তিনিও তখন ভাল বাংলা বুঝিতেন না। এইজন্য গুপ্তমহারাজ ও বসন্ততে বেশ মিল হ'য়েছিল। তারপর বসন্ত কয়েক মাস

পরে কোথায় চলিয়া গেল। তা'র আর কিছু সংবাদ পাওয়া গেল না।

আলমবাজার মঠে একদিন গরমীকাল রবিবারে, একখানি গাড়ী করিয়া একটী স্ত্রীলোক দু' একটী পুরুষ সঙ্গে করিয়া আসিলেন। গাড়ীখানি রাস্তায় দাঁড়াইয়া রহিল এবং একটী ছেলে আসিয়া বড় ঘর থেকে তারকদা'কে ডাকিয়া লইয়া গেল। গাড়ীর ভিতরের স্ত্রীলোকটী তারকদা'কে দেখিয়াই বিলাপ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার মাথাটা একটু খারাপ হইয়া গিয়াছিল, কথাগুলি বড় এলোমেলো। তারকদা গাড়ীর কাছে যাইয়া সেই স্ত্রীলোকটীকে অনেক সান্ত্বনার কথা বলিতে লাগিলেন। তারপর স্ত্রীলোকটী একটু ঠাণ্ডা হইয়া চলিয়া গেলেন। তারকদা ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "বসন্ত'র মা এসেছিল। মাথাটার একটু গোল হ'য়েছে। বড় কান্নাকাটী কর্‌ছিল।" বসন্ত তখন বেঁচেছিল কি মারা গিছ্‌লো তার কোন খবর ছিল না। যাহা হ'ক, তারকদা'র এমন মিষ্ট ও স্নেহপূর্ণ বাক্য ছিল যে, পুত্রশোকা স্ত্রীলোকটী শান্ত হইয়া চলিয়া গেলেন।

ধ্যানের প্রতিমূর্ত্তি—

কখনও কখনও বড় ঘরের সুমুখে ভিতরকার যে দালানটা ছিল, সেইখানে তারকদা অতি স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতেন,

যেন নিতান্ত শিশুবালক, অতি সংযত ও আত্মহারা, জগৎ ও দেহ হইতে মনটা কোথায় চ'লে গেছে। সর্ব্বদাই যেন বিভোর ও আত্মহারা। সেই সময় তাঁ'কে কেউ কিছু প্রশ্ন কর্‌লে দু'একটা কথা যেন বিভোর অবস্থা থেকে অতি মিষ্ট ও মধুর ভাষায় তাঁর মুখ দিয়ে বেরুতো। কথার অর্থ আমি বলিতে'ছ না — কণ্ঠস্বর, দৃষ্টি ও মুখভঙ্গী অতীব মধুর ও আকর্ষণীশক্তিপূর্ণ ছিল। সেই সময়টা যেন তিনি স্নেহ, ভালবাসা, ঋজুতা ও ধ্যানের প্রতিমূর্ত্তি হ'য়েছিলেন।

আলমবাজার মঠে সকলের একত্রিত হওয়া—

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে, বাইরে থেকে সকলে একে একে আলমবাজার ফিরে এলেন। রাখালমহারাজ ও হরিমহারাজ কয়েক বৎসর পর ফিরে এলেন। তুলসীমহারাজ ও কালীবেদান্তী গঙ্গাধর মহারাজকে সঙ্গে ক'রে এলেন। দীনমহারাজ বৎসর খানেক আগে মঠে এসেছিলেন। গুপ্ত মহারাজও তখন ছিলেন। সকলেই মঠে একত্রিত হ'লেন। এই সময় প্রত্যেকেই উচ্চ অবস্থায় যাবার জন্য চেষ্টা ক'র্‌ছিলেন এবং সকলেই উচ্চমার্গের সাধকও হ'য়েছিলেন। ঠিক যেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ এক দেহ বিলুপ্ত ক'রে কয়েকটী দেহ ধারণ ক'রে বিচরণ কর্‌তেন। মঠেতে এতগুলি লোক বাস কর্‌তেন কিন্তু সকলেই আপন আপনভাবে জপধ্যান ক'রছেন! এইজন্য কোন আওয়াজ

বা কোন চাঞ্চল্যের ভাব ছিল না। কেউ জোরে পা ফেলে চল্‌তেন না বা চীৎকার ক'রে কথা কইতেন না—পাছে অপরের ধ্যান বা জপে কোন বিঘ্ন হয়। প্রত্যেকেই যেন অপরের কাছে বিনয়ী ও নম্র। কি ক'রে অপরকে ভালবাসতে হয়, শ্রদ্ধা কর্‌তে হয়, সম্মান দেখাতে হয় বা সেবা ক'র্‌তে হয় এইটাই যেন সকলের ভিতর বিশেষ চিন্তার বিষয় ছিল। এই রকম পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও সম্মান দেখান একটা আদর্শ হইয়া রহিল। এই সময়ে সকলে নিঃস্বার্থ প্রেমিক ও সর্ব্বত্যাগী সাধক হ'য়েছিলেন। এইটাই ছিল তখনকার প্রধান ভাব।

স্বামী বিবেকানন্দ –

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে, নরেন্দ্রনাথ মান্দ্রাজ হইতে স্বামী বিবেকানন্দ নামে পরিচিত হন এবং বোম্বাই হইতে জাপান দিয় আমে-রিকায় ভ্যান্‌কুভার যান। তথা হইতে চিকাগো (Chicago) উপস্থিত হন। তাঁহার যাত্রার কথা অল্প-সংখ্যকের ভিতর জ্ঞাত ছিল। তিনি নিষেধ করিয়াছিলেন যেন এবিষয়ের কোন কথা প্রকাশ না পায়; কারণ তখনও তিনি ভবিষ্যৎ কৃতকার্য্যতার উপর সন্দিহান ছিলেন। এইজন্য কয়েকটী মাত্র লোকের ভিতর এবিষয়ের কথাবার্ত্তা গোপন ছিল। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে, সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর মাসে কলিকাতার সংবাদ পত্রে তাঁহার

সাফল্যের বিষয় প্রকাশ পাইল। স্বামী বিবেকানন্দ লোকটী কে, তাহা জানিবার জন্য কলিকাতার সকলেই উৎসুক হইলেন এবং পরে সকলে ইহা বুঝিতে পারিলেন। স্বামীজির এই কার্য্যের সফলতার জন্য প্রায় সকলেই বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন। তবে একটা অপ্রিয় ব্যাপারও হইয়াছিল, কিন্তু ইহা স্পষ্ট জানা আবশ্যক যে, শিবানন্দ সে অপ্রিয় ব্যাপারে ছিলেন না—বরং অপ্রিয় কথা বা কার্য্য যাহাতে না হয় তাহার জন্য তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন।

এই সময় কলিকাতায় ও বাঙ্গলা দেশের নানা স্থানে স্বামীজির কথাবার্ত্তা লইয়া বিশেষভাবে আলোচনা হইতে লাগিল। নানা স্থানে সভা, অভিনন্দন ও বক্তৃতা ইত্যাদি হইতে লাগিল। বাঙ্গলা দেশটা একবারে গরম হইয়া উঠিল। ভারতবর্ষের সমস্ত হিন্দুজাতি নিজেদের বিজয় হইয়াছে এই জ্ঞানে পরস্পরে সঙ্ঘবদ্ধ ও সংশ্লিষ্ট হইতে লাগিল। হিন্দুজাতির নব জাগরণ ও নব অভ্যুত্থান বিশেষভাবে এই সময় হইতেই হইল। মান্দ্রাজ হইতে পাঞ্জাব পর্য্যন্ত সকলেই আত্মশ্লাঘা বোধ করিতে লাগিলেন এবং প্রাদেশিক ভাব পরিত্যাগ করিয়া সমগ্র হিন্দুজাতি যে পাশ্চাত্য জাতির উপর বিজয়লাভ করিয়াছে এই চর্চ্চা চলিতে লাগিল।

• যেমন একদিকে বহুলোক স্বামীজিব পক্ষ অবলম্বন করিলেন, অপরদিকে ব্রাহ্মসমাজ ও খৃষ্টান সমাজ বিপরীত

মত অবলম্বন করিলেন এবং স্বামীজির কুৎসা করিতে লাগিলেন। এই সময় শরৎ মহারাজ, কালীবেদান্তী, সান্ন্যাল মশায় (শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠ নাথ সান্ন্যাল) এই তিন জন বিশেষভাবে অগ্রণী হইয়া স্বামীজির জন্য নানা স্থানে সভা, অভিনন্দন ইত্যাদি করাইতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে যুবকেরা অনেকে ইঁহাদের পদানুগ হইলেন এবং ক্রমে ক্রমে মঠের সকলেই শরৎ মহারাজ, কালীবেদান্তী ও সান্ন্যাল মহাশয়ের পন্থার অনুগামী হইলেন এবং অল্পমাত্র যে অপ্রিয় কার্য্য হইয়াছিল তাহাও তিরোহিত হইল।

স্বামীজির বিষয় লইয়া সকলেই এত উত্তেজনাপূর্ণ হইয়াছিলেন ও এত মাতিয়া গিয়াছিলেন যে, শিবানন্দের জীবনের এই সময়টার প্রতি কাহারও বিশেষ দৃষ্টি ছিল না। সেইজন্য তাঁহার জীবনের এই সময়কার ঘটনার বিষয় বিশেষ কিছু বলিতে পারিলাম না।

সঙ্ঘের সঞ্চিত শক্তি বিকাশের আবশ্যক বোধ—

এই সময় মান্দ্রাজ হইতে শ্রীনিবাস সামান্নিয়া আয়ার নামক এক মান্দ্রাজী যুবক আলমবাজারে আসিলেন এবং তাঁহার অনুসন্ধানে তাঁহার আত্মীয়গণ ও স্বামীজির অন্যান্য ভক্ত সকলও আসিলেন। আলাসিঙ্গা কিড়ি প্রভৃতি অনেক মান্দ্রাজী ভক্তদিগের সহিত পত্রাদি চলিতে লাগিল। এদিকে জয়পুরের

অন্তর্গত ক্ষেত্রীর রাজা অজিৎ শিং—যিনি পূর্ব্বেই স্বামীজির শিষ্য হইয়াছিলেন, তিনিও পত্রাদি লিখিতে লাগিলেন। এইরূপ নানা স্থান হইতেও পত্রাদি আসিতে লাগিল। গুজরাটের জুনাগড়ের দেওয়ান, স্বামীজির বিশেষ ভক্ত হরিদাস বিহারীদাস শীতকালে 'অহিফেন-অনুসন্ধান সংসদএর' (Opium Commission) সভ্য হইয়া কলিকাতায় আসেন। তিনি আলমবাজার মঠে গিয়া ভাণ্ডারা দিয়াছিলেন। এইরূপে নানা দেশ ও নানা স্থান হইতে পত্রাদি আসিতে থাকায় আলমবাজার মঠ একটা কেন্দ্রীয় স্থান হইয়া উঠিল। সমস্ত বাঙ্গলা দেশ, এমন কি সমস্ত ভারতবর্ষ, এই স্থান ও এই সঙ্ঘকে শীর্ষস্থানীয় বলিয়া গণ্য করিতে লাগিল। এই সময় হইতে মঠে কার্য্য করিবার প্রয়াস আসিল। নির্জ্জনে বসিয়া, নিঃসঙ্গ হইয়া তপস্যা করার ভাব তত আর রহিল না। সঞ্চিত শক্তির বিকাশ করা এখন হইতে নিতান্ত আবশ্যক বোধ হইল।

শিবানন্দ স্বামীর উপর স্বামীজির রাগ ও অভিমান—

বিশ্ববিশ্রুত স্বামী বিবেকানন্দ শিবানন্দ স্বামীকে উৎসাহিত করিবার জন্য আমেরিকা হইতে মাঝে মাঝে পত্র লিখিতেন এবং ভবিষ্যতে কিরূপে কার্য্য করিতে হইবে সেই সকল প্রণালীও তিনি পত্রে উল্লেখ করিতেন। শিবানন্দ স্বামী তপস্যায় অতি উচ্চ অবস্থার লোক—এই ধারণায় স্বামীজি

তাঁহাকেই উল্লেখ করিয়া পত্রাদি লিখিতেন। এমন কি তাঁহার প্রতি কখনও কখনও রাগ অভিমানও করিতেন—এমন উন্নত অবস্থার লোক যেন নিভৃতে বসিয়া না থাকেন। আবার অনেক সময় তিনি প্রায় প্রত্যেকেরই নাম উল্লেখ করিয়া কার্য্য করিতে উৎসাহিত করিতেন।

শরৎমহারাজের পাশ্চাত্য দেশে গমন—

এইরূপে কার্য্য করিবার জল্পনা চলিতেছে, এমন সময় এক পত্র আসিল যে স্বামীজি কার্য্য করিয়া নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, এইজন্য একটী সহকর্ম্মীর আবশ্যক হইয়াছে। স্বামীজি প্রথমে শশীমহারাজের আমেরিকা যাইবার কথা লিখেন; কিন্তু তাঁহার শরীর অসুস্থ থাকায় শরৎমহারাজ যাইতে প্রস্তুত হন এবং ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে শরৎমহারাজ ইংলণ্ডে গমন করেন। স্বামীজির তখন আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে আসিবার কথা স্থির হইয়াছিল। শরৎমহারাজ লণ্ডনে কিছু দিন থাকিয়া গুড্‌উইনের (Goodwin) সহিত আমেরিকায় চলিয়া গেলেন। নভেম্বর মাসে অভেদানন্দ স্বামী স্বামীজির সহকর্ম্মীরূপে লণ্ডনে গেলেন এবং তথায় কিছুদিন থাকিয়া তিনি আমেরিকায় চলিয়া যান।

স্বামীজির প্রত্যাবর্ত্তন ও তিরোভাব—

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন

করেন এবং কিছুদিন আলমবাজার মঠে ও বেলুড়ের আর একটী স্থানে থাকিয়া বর্ত্তমান বেলুড় মঠ স্থাপন করেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে, ৪ঠা জুলাই তাঁ'র তিরোভাব হয়। আমি সেই সময় কাশ্মীরে ছিলাম। শরৎমহারাজের টেলিগ্রাম পাইয়া কয়েকদিন পরে বেলুড়মঠে আসিলাম। শিবানন্দ স্বামী এই সময়ে কাশীতে ছিলেন।

শিবানন্দ স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ—

আমি কয়েক বৎসর (১৮৯৬ হইতে ১৯০১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) ভারতবর্ষের বাহিরে ছিলাম। এইজন্য মধ্যকার এই কয়েক বৎসরের কোন বিশেষ সংবাদ জানি না। আমি মঠে ফিরিয়া আসিবার প্রায় মাস ছয় পরে শিবানন্দ স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ হয়।

৺ কাশীধামে রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমের কথা—

কাশীর অদ্বৈত আশ্রম প্রথমে ভাড়া বাড়ীতে ছিল এবং ঐ স্থানটা নাকি রামলীলার মেলার জায়গা ছিল। শুনিয়াছি যে তারকদা এই সময় আশ্রমে অতি কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। সারাদিন জপ করিতেন; বড় একটা বেরুতেন না। নিতান্ত আবশ্যক হ'লে তবে তিনি বেরুতেন।

তারকদা এই সময়কার একটী গল্প বলিয়াছিলেন—একটী ছেলে আসিয়া জুটিল। সে ব্রহ্মচারী হইয়া ঠাকুরের পূজাদি করিত এবং তারকদা'র বেশ অনুগত হইল। বৎসর খানেক বা

বৎসর দেড়েক সে বেশ সাধু হইয়া আশ্রমে কাজ করিতে লাগিল। বাড়ীর ভাড়া দেওয়া হয়নি, এইজন্য বাড়ীওয়ালা আসিয়া বাড়ীর ভাড়া তাগাদা করিতে লাগিল। তারকদা দু'এক জায়গা হইতে বাড়ীর ভাড়াটী জোগাড় করিয়া ঠিক্ করিয়া রাখিলেন। ভাড়া চাহিতে আসিলেই তিনি দিয়া দিবেন এইরূপ স্থির করিলেন। ছেলেটীর কি দুর্ম্মতি হইল—সে টাকাগুলি লইয়া রাত্রে কোথায় পালাইয়া গেল! সকাল বেলাতে তাহার দেখা নাই! এদিকে তারকদা আতান্তরে পড়িলেন। সকালে কি করিয়া ঠাকুরের ভোগ দেওয়া হইবে তাঁহার কিছুই সংস্থান নাই! যে জায়গাটায় টাকা রাখিয়াছিলেন খুঁজিয়া দেখেন যে, সেখানে একটা পয়সা প'ড়ে আছে। সেই একটা পয়সায় বাতাসা এনে ঠাকুরকে তো ভোগ দিলেন! এই ব্যাপারে তারকদা বেশ একটা কথা বলিতেন—"ছেলেটার অভাব হ'য়েছিল, সেইজন্য টাকা নিয়ে চ'লে গিছ্‌ল; কিন্তু তার ধর্ম্মজ্ঞান ছিল। ঠাকুরের প্রতি বেশ শ্রদ্ধা ছিল। একটা পয়সা তো রে'খে গিছ্‌লো? ঠাকুরের ভোগ দেওয়া তো আটকাল না! তা আর কি হ'বে! অভাবে প'ড়েছিল তাই নিয়েছে! আর আমার তো কাজ চ'লে গেল! বাড়ীভাড়াটাতো কোন রকম্ ক'রে দেওয়া হ'ল পরে! তা ছেলেটা তেমন খারাপ নয়—ধর্ম্মজ্ঞান একটু ছিল! তাই ঠাকুরের ভোগের জন্য একটা পয়সা রে'খে গিছ্‌ল!"

৺কাশী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন—

১৯০২ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে তারকদা কাশী হইতে ফিরিয়া আসিলেন। সাধারণ রম্‌তা সাধুর ন্যায় একদিন সকালে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কাছে সামান্য দু'একখানি কম্বল, কৌপীন, বহির্ব্বাস ও একটী কমণ্ডলু। সে সময়ে তিনি বয়সে সকলের চেয়ে বড় ছিলেন, এইজন্য রাখাল-মহারাজকেও "রাখাল" বলিয়া ডাকিতেন। রাখালমহারাজও অতি সসম্ভ্রমে তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ প্রদর্শিত অদ্বৈত ভাব—

তারকদা একদিন বলিতে লাগিলেন, "কাশীতে যখন রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম হ'ল, তখন কাশীবাসী অনেকেই আপত্তি তুল্‌লেন—'অদ্বৈত আশ্রম বল্‌ছেন, আবার এখানে পূজা হোম ইত্যাদি হচ্ছে কেন? এসব হ'ল অদ্বৈত মতের বিরোধী ভাব!' এইরূপে অনেকেই অনেক প্রকার আপত্তি তুল্‌তে লাগ্‌লেন। আমি ইহাতে কিছু ক্ষুণ্ণ হ'য়েছিলুম। শেষে জিজ্ঞাসুদিগকে বুঝিয়ে দিলুম যে, নীরস অদ্বৈতবাদ—সে ভাব এখানে নহে। এখানে হচ্ছে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ প্রদর্শিত অদ্বৈত-ভাব। এখানে 'রসে বশে—সারে মাতে' বস্তু থাক্‌বে। অধিকারী হিসাবে অদ্বৈত জ্ঞানও থাক্‌বে ভক্তি, পূজা, পাঠ ইত্যাদিও থাক্‌বে। একঘেঁয়ে অদ্বৈতবাদ হ'লে প্রাণটা বড় শুষ্ক হ'য়ে

যায়। ভক্তি প্রাণকে সরস রাখ্‌বার একটা উপায়। আর কর্ম্মও নিতান্ত আবশ্যক—এও এক বড় সাধনা।” তারকদা বহুবিধ ভাবে এই কথাগুলি এমন বুঝাইতে লাগিলেন যে, সকলেই শুনিয়া আনন্দিত হইলেন। রামকৃষ্ণ মিশনের যে বহুমুখী ভাব আছে বা হওয়া উচিত, তাহা তিনি সেই দিন সকলকে বেশ স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। আমরা সকলেই তাহা শুনিয়া সুখী হইয়াছিলাম।

মুসলমান ভক্তের আগমন—

একদিন গরমীকাল, দুপুরবেলা সম্ভবতঃ রবিবার, আমি ও কতিপয় ব্যক্তি গঙ্গা ও মাঠের দিকের ঘরটীতে বসিয়া আছি। কথা চলিতেছিল যে, ঠাকুরের দরবারে সব রকম ব্যক্তি আগমন করে, কিন্তু ঠাকুরের মুসলমান ভক্ত কৈ? এই বিষয়ে পরস্পরের ভিতর আলোচনা চলিতেছিল এবং আমরা এক একবার গঙ্গার দিকে মুখ ফিরাইয়া দেখিতেছিলাম যে, যাত্রীভরা নৌকা একখানা গঙ্গা দিয়া চলিয়া যাইতেছে। তারকদা তখন ভিতরকার দালানের বেঞ্চিখানিতে বসিয়াছিলেন। মিনিট পাঁচ সাত পর, তারকদা আহ্লাদে এক উচ্চ চীৎকার করিয়া আমায় ডাকিতে লাগিলেন—“মহিন, শীঘ্র এদিকে এস!” আমি সসম্ভ্রমে যাইলাম। দেখিলাম, গুটীকতক বাঙ্গালী ভদ্রলোক বেঞ্চির কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। তাহার

ভিতর একজন লোকের হাতে একটী হাঁড়ী—ঠাকুরের জন্য মিষ্ট এনেছেন। লোকটীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তারকদা বলিলেন, "ইনি কে বল দেখি?" সেই ব্যাক্তি তখন তাঁ'র মুসলমান নামে পরিচয় দিলেন। আমি আহ্লাদে এক চীৎকার দিলুম। ঘরের সকল লোক তখন দৌড়ে এলো। তারকদা তখন সেই মুসলমান বাবুটীর পরিচয় দিয়া দিলেন। এইতো সকলে মহা আনন্দ করিতে লাগিলেন। সকলেই বলিলেন—এইমাত্র এই বিষয় কথা হইতেছিল, আর তখনি ইচ্ছাপূর্ণ হইল! তদবধি তারকদা সেই মুসলমান ভক্তটীকে বিশেষ যত্ন করিতেন এবং নিজের করিয়া লইয়াছিলেন।

একদিন ঠাকুরের তিথি পূজা, মুসলমান বাবুটীর আফিস হইতে মঠে আসিতে প্রায় সন্ধ্যা হয়েছিল! পাঁচটা সাড়ে পাঁচটার সময় তিনি ভিতরকার দালানটাতে প্রসাদ পাইতে বসিলেন। তারকদা ও আমি দাঁড়াইয়া তাঁহাকে আহার করাইতে লাগিলাম। তিনি বেশ পরিতোষ করিয়া আহার করিলেন। সর্ব্বদাই তিনি আনাগোনা করিতেন, এই জন্য উড়ে চাকররা তাঁহাকে চিনিত। তাঁহার আহার হইয়া গেলে উচ্ছিষ্ট পাতা মুক্ত করিতে উড়ে চাকররা অনিচ্ছা প্রকাশ করিল। তারকদা আমাকে বলিলেন, "চাকরদের উপর জেদ্ করবার দরকার নেই। তুমি এক বাল্তি জল নিয়ে এস! তুমি জল ঢাল, আর আমি ঝাঁটা দিয়ে সব মুক্ত ক'রে ফেলি।" এই ব'লে

তারকদা শালপাতা, খুরি, ভাঁড় সমস্তই গঙ্গার ধারে ফেল্‌লেন। আমি জল ঢাল্‌তে লাগ্‌লুম ও তিনি ধুতে লাগ্‌লেন। তিনি যেন জোর ক'রে আমার হাত থেকে কাজটা কেড়ে নিয়ে কর্‌তে লাগ্‌লেন!

দীনবন্ধুর কথা—

পাঞ্জাব হইতে একটী যুবক মুসলমান ভদ্রলোক আসিলেন। তাঁহার নাম দানমহম্মদ। তিনি স্বামীজি ও ঠাকুরের খুব ভক্ত। সাধারণতঃ তাঁহাকে "দীনবন্ধু" বলা হইত এবং সেই নামেই তিনি পরে পরিচিত হইয়াছিলেন। তিনি হইতেছেন রাজপুত চোহান মুসলমান অর্থাৎ বাড়ীতে কতকটা হিন্দু আচারও রাখেন এবং হিন্দু জ্ঞাতি গোষ্ঠীর সহিত মেলা মেশাও আছে, আবার মুসলমানও বটে। দীনবন্ধু প্রথম আসিলে, যাঁহারা একটু গোঁড়া ভাবের লোক তাঁহারা একটু আপত্তি করিয়াছিলেন এবং এক পংক্তিতে খাইতে বিশেষভাবে অনিচ্ছুক ছিলেন। এ বিষয়ে প্রথমে একটু কথাবার্ত্তাও হইয়াছিল; কিন্তু তারকদা এই যুবকটীর প্রতি একটু সদয় ছিলেন। তিনি নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী দীনবন্ধুকে একরূপ মঠের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন। সেই পর্য্যন্ত সকলে দীনবন্ধুকে মঠের লোক বলিয়া জানিত। তারকদা সময় মত দীনবন্ধুকে জপ, ধ্যান ইত্যাদি নানা বিষয় শিখাইতেন এবং দীনবন্ধুও তারকদা'র

উদার ভাব দেখিয়া তাঁহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে দীনবন্ধু একজন মঠের লোক হইলেন এবং মঠের অল্পবিস্তর কাজও করিতেন। তাঁহাকে লইয়া আর কোন আপত্তি রহিল না। দীনবন্ধু কখনও মঠে থাকিতেন এবং কখনও বা ৩নং গৌরমোহন মুখুজ্জ্যের ষ্ট্রীটের বাটীতে থাকিতেন। তিনি এইরূপে প্রায় দেড় বৎসর কাল ছিলেন। তারপর শরীর অসুস্থ হওয়ায় তিনি পাঞ্জাবে চলিয়া যান। রাখাল মহারাজও তাঁহাকে বিশেষ আদর করিতেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে, যখন আমি কন্‌খলে ছিলাম তখন দীনবন্ধু প্রায় মাসখানেক কন্‌খল সেবাশ্রমে ছিলেন। যাহা হউক, তারকদা দীনবন্ধুকে জপ, ধ্যান ইত্যাদি বিষয়ে নানা উপদেশ দিয়াছিলেন।

মান্দ্রাজী খৃষ্টানকে খাওয়ান—

এক বৎসর শীতকালে, উঠানে সকলের ঠাঁই হয়েছে। তারকদা অনেক্ষণ ধ'রে আমাকে খোঁজাখুজি ক'রে বেড়াচ্চেন। আমি এদিক ওদিক কাজ ক'রে বেড়াচ্ছিলুম। এইজন্য আমায় দেখতে পান্‌নি। হঠাৎ, সুমুখে আমায় দেখে তিনি ব্যগ্রসমস্ত হ'য়ে বল্‌লেন, "ওহে! মান্দ্রাজ থেকে একটী খৃষ্টান এসেছে। তুমি তা'কে দেখাশুনা কোরো। কাছে বসিয়ে খাইও, যেন ঠাকুরের স্থানে এসে কোন বিষয়ে সে মনক্ষুণ্ণ না হয়।" আমি বল্‌লুম, "হাঁ! আমি শুনেছি, সে

সব বন্দোবস্ত করেছি।" তারপর উঠানের মাঝে, পংক্তিতে আমরা বস্‌লুম। প্রথম আমেরিকার ডাক্তার Dr. Hallock, তারপর আমি, তারপর মান্দ্রাজী খৃষ্টানটী, তারপর দীনবন্ধু (দীনমহম্মদ—পাঞ্জাবী মুসলমান), আর আশে পাশে ভক্ত-মণ্ডলী। চতুরঙ্গ হয়েতো বসা গেল! সকলেই জানত, সকলেই দেখ্‌লে, কিন্তু কেউ দ্বিধা কর্‌লে না। সেই মান্দ্রাজী খৃষ্টানটী পরিতোষ করিয়া আহার করিল। লোকটীর বয়স হইয়াছিল, আফিসে চাকরী করিত। ছুটী লইয়া কলিকাতা দর্শন করিতে আসিয়াছিল। খৃষ্টান বলিয়া কেহই তাহাকে স্থান দেয়নি, কেহই তাহার সঙ্গে মেশেনি। লোকটী এইরূপ যত্ন ও আদর পাইয়া আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিল এবং বারংবার বলিতে লাগিল, "এই রকম ভালবাসা—আমি কোন জায়গায় পাইনি! মান্দ্রাজ থেকে এত জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্চি, সব জায়গাই খৃষ্টান বলে অবজ্ঞা করে, দূর ছাই করে! এরূপ ভালবাসা এরূপ যত্ন আমার কল্পনারও অতীত!" লোকটী এইরূপ বলিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া তারকদা'কে অতি ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া সন্ধ্যার সময় চলিয়া গেল। এই উপাখ্যানটীতে তারকদা'র যে কিছুমাত্র সাম্প্রদায়িক ভাব ছিল না, সকলকেই যে সমান ভালবাসিতেন, সঙ্কীর্ণভাব বা গণ্ডী তাঁহার যে কিছুই ছিল না, অতি উদার প্রকৃতির ও সরল ভাবের লোক যে তিনি ছিলেন তাহা বেশ বুঝা

যায়। সঙ্কীর্ণ গণ্ডীকে, সাম্প্রদায়িকতাকে তিনি অতিশয় ঘৃণা করিতেন।

একটী পাঞ্জাবী মুসলমানকে খাওয়ান—

একদিন, প্রায় বেলা দেড়টা দু'টার সময় একটী পাঞ্জাবী মুসলমান আসিয়া উপস্থিত হইল। লোকটীর ময়লা কাপড় —বিপন্নাপন্ন। তারকদা তাহাকে গঙ্গার ধারে বারাণ্ডাতে বসাইলেন এবং নিজে বড় বেঞ্চিতে বসিয়া রহিলেন। গুপ্ত-মহারাজের তখন বড় অসুখ। ভিতরকার পীচ দেওয়া ঘরটীতে আমি তাঁহার কাছে বসিয়াছিলাম; তারকদা আমাকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং সেই মুসলমানটীর সহিত কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। ক্ষুধার্ত্ত দেখিয়া সেই পাঞ্জাবীটীকে তখনি মোটা মোটা রুটী ও খানিকটা চিনি আনাইয়া দিলেন। ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিটী সেই গরম রুটী ও চিনি খাইয়া বড়ই পরিতুষ্ট হইল। তাহার পর সে বলিতে লাগিল যে তাঁহার বাপ ইংরাজ, মা মুসলমান রমণী। দেশ—পাঞ্জাবে। তারকদা এই কথা শুনিয়া তো বড় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং লোকটীকে বিশেষ করিয়া যত্ন আয়ত্তি করিতে লাগিলেন। লোকটী আহারাদি করিয়া চলিয়া গেল। লোকটী চলিয়া গেলে আমি বলিলাম, "এরা হইতেছে সেনানিবাস বালক (Cantonment boy); রাওলপিণ্ডি, আম্বালা প্রভৃতি স্থানে যেখানে

ইংরাজ পল্টন থাকে, সেইখানে এইরূপ মিশ্রবর্ণ সন্তান হয়।” তারকদা এইসব কথা জানিতেন না, এইজন্য আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। যাহা হউক, মুসলমান বলিয়া তাঁহার কোন্ দ্বিধা বা ঘৃণার ভাব ছিল না।

একটী বাগ্দীযুবকের কথা—

গরমীকালে, একদিন ডায়মণ্ডহারবার থেকে একটী যুবক দীক্ষা লইবার জন্য আসিল। জাতিতে বাগ্দী, কাল দোহারা চেহারা, বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ, এণ্ট্রানস্ পর্য্যন্ত পড়া বা পাশ করা। গায়ে জামা, উড়ানি বেশ আছে। যুবকটী রান্নাঘরের দরজার দিকে—পংক্তির শেষ প্রান্তে বসিয়া প্রসাদ পাইল। আহার সমাপ্ত করিয়া সকলে মুখ ধুইয়া আসিবার পর, কোন ব্যক্তি সেই যুবককে ভৎসনা করিতে লাগিল, “তোর এত বড় সাহস! তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা! তুই বাগ্দী হ’য়ে ব্রাহ্মণ কায়স্থদের পংক্তিতে খাস্? সাধুদের সঙ্গে এক সঙ্গে বসে আহার করিস্? তোর্ বুকে ভয় এলো না?” এই প্রকার নানারূপ কথা কহিয়া তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিল। যুবকটী অপ্রস্তুত ও লজ্জিত হইয়া পড়িল। আমার দেখিয়া মনে বড় কষ্ট হইতে লাগিল। আমি তখন বলিলাম, “আচ্ছা, বকাবকির আবশ্যক কি? তারকদা তো মহাপুরুষ,—উনি যা ব’ল্‌বেন মেনে নেওয়া

হ'বে।" তারকদা তখন দালানের বড় বেঞ্চিটীতে বসিয়া তামাক খাই'তছিলেন। তারকদা'কে সব কথা বলা হইল। তিনি স্নিগ্ধ ভাবে বলিতে লাগিলেন, "দেখ! এটা ঠাকুরের দরবার। ভগবান্ লাভ, সাধন ভজন—এই হ'ল এখনকার মুখ্য উদ্দেশ্য। ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি রাখে ও সাধন ভজন করে—এইটাই হচ্চে দেখ্‌বার জিনিষ। বামুন কি কায়েৎ, কি বাগ্দী, এ কথার কোন আবশ্যক নেই; কারণ এখানে কুটুম্বিতা করা বা বিবাহাদি দেওয়া বা সামাজিক অন্য কোন কাজ করা উদ্দেশ্য নয়। এখানে হ'ল সাধন ভজনের স্থান, সামাজিক ব্যাপারের সঙ্গে কোন সংশ্রবই নেই। যে ঠাকুরকে মান্‌বে, সাধন ভজন কর্‌বে, সেই এখানে থাক্‌তে পার্‌বে। জাতাজাতির কথাটা এখানে হওয়া উচিত নয়।" তারকদা এই কথাগুলি এমন স্নিগ্ধ ও মধুর ভাবে বলিতে লাগিলেন যে, আমি শুনিয়া একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া তারকদার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম,—'দেখ, এই লোকটীর কি উদার ভাব! সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী এই লোকটার ভিতর কিছুমাত্র নাই। যথার্থই লোকটা মহাপুরুষ বটে!'

একটী যুবকের ৺ কালীপূজা করা—

একটী যুবক আসিয়া ব্রহ্মচারী হইল। একদিন ৺কালী-

পূজার রাত্রে তারকদা তাহাকে পূজা করিতে আদেশ করিলেন ; কিন্তু একটী বৃদ্ধ নানাপ্রকার আপত্তি তুলিতে লাগিলেন। প্রথম তিনি বলিলেন, "উপবীত না থাক্‌লে কালীপূজা করা নিষিদ্ধ।" এইরূপ নানা তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন। তারকদা বলিলেন, "এ ব্রহ্মচারী, ব্রাহ্মণ শরীর, ইহার উপবীতের কোন আবশ্যক নেই। এ স্বচ্ছন্দে পূজা কর্‌তে পারে।" বৃদ্ধটী দ্বিতীয় আপত্তি তুলিলেন, "পূর্ণাভিষিক্ত না হ'লে কালীপূজা কর্‌বার অধিকার নেই।" এইরূপ নানাপ্রকার ওজর আপত্তি দেখাইতে লাগিলেন। তারকদা একটু বিরক্ত হইয়া দৃঢ়ভাবে বলিলেন, "এ তোমার সমাজ নয়, গৃহস্থালী পূজারীগিরির ভাব নয়। এখানে অন্যবিধ ভাব। এ হচ্চে শুদ্ধ পবিত্র বালক, ব্রহ্মচারী, ব্রাহ্মণ শরীর, ভক্তিমান। এ নিঃসঙ্কোচে কালীপূজা কর্‌তে পারে। তোমার গৃহস্থালী ভাব এখানে নয়।" তারকদা এইভাবে গুটীকতক বেশ কড়া কথা বলিয়াছিলেন। তাহাতে আমরা উপস্থিত সকলে বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম। বুঝিলাম যে তারকদার ভিতর বেশ শক্তি আছে এবং আবশ্যক হইলে তিনি সে শক্তি বিকাশ করিতে পারেন। মোট কথা, তিনি যে পুরাণ ধারার বিরোধী ছিলেন তা'ও নয়---তাহাও তিনি মানিতেন ; কিন্তু যেখানে আবশ্যক বিবেচনা করিতেন, সেখানে পুরাণ ধারা বন্ধ করিয়া দিয়া নূতন ধারার প্রবর্ত্তন করিতেন। তিনি সময়োপযোগী আবশ্যকীয়

পরিবর্ত্তন করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। গোঁড়ামী, বিধি নিষেধ তিনি আদৌ পছন্দ করিতেন না এবং অনাবশ্যক পরিবর্ত্তন বা হৈ চৈ করাও তাঁর অভিপ্রেত ছিল না। যেখানে যেটুকু আবশ্যক, তিনি সেইটুকুই পরিবর্ত্তন করিতেন। এইজন্য তিনি এত লোকরঞ্জন হইয়াছিলেন।

জাতাজাতির কথা—

একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ জীবনের শেষভাগে সন্ন্যাস লইয়াছিলেন। যদিও তিনি সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন কিন্তু পূর্ব্বতন গোঁড়া ব্রাহ্মণের ভাব তাঁহার ভিতর ছিল অর্থাৎ বুড়ো ব্রাহ্মণের যেমন গোঁড়ামী হ'য়ে থাকে সেই রকমই ছিল—বিশেষ কিছুই ব্যতিক্রম হয়নি। উঠানে যখন বিশেষ দিনে ভক্তেরা সব প্রসাদ পাইতে বসিতেন, তিনি স্বভাব অনুযায়ী বলিতেন, "ব্রাহ্মণেরা এদিকে বস্‌বেন! অন্যেরা একটু দূরে বস্‌বেন!" ইহাতে উপস্থিত ভক্তদিগের ভিতর একটু বেশ বিরক্তির ভাবও আসিত। কোন ভক্ত মঠে আসিলে তিনি স্বভাব অনুযায়ী কি নাম, কি বংশ, কা'র সন্তান ইত্যাদি সামাজিক ভাবে সব কথা জিজ্ঞাসা করিতেন এবং কায়স্থ হইলে নামের সহিত যদি "দাস" শব্দ ব্যবহার না করিতেন, তাহা হইলে তিনি গোঁড়া ব্রাহ্মণের ন্যায় বিদ্রূপ করিতেন ও বিরক্ত হইতেন। এইরূপ কিছুদিন চলিতে লাগিল। সকলেই ইহাতে সেই বৃদ্ধটীর প্রতি একটু অসন্তুষ্ট হইলেন; কিন্তু মুখে কেউ কিছু বলিলেন

না। একদিন সকাল নয়টা সাড়ে নয়টার সময় কতকগুলি ভক্ত আসিয়াছিলেন। সেই বৃদ্ধটী স্বভাব অনুযায়ী তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা স্বুরু করিলেন এবং আগন্তুক ভক্তেরা তাহাতে একটু ক্ষুণ্ণ হইলেন। তারকদা উপস্থিত ছিলেন। ইহা শুনিয়া বিরক্ত হইয়া সেই বৃদ্ধটীকে বেশ শুনিয়ে দিলেন। তারকদা বলিতে লাগিলেন, "এখানে আবার জাতাজাতির কথা কিসের? ঘড়, বাড়ী, সমাজ সব ত্যাগ ক'রে সকলে এখানে এসেছি। ভগবান্ লাভ ক'রবো—উদ্দেশ্য। কার সন্তান, কি বংশ, কার পৌত্র—এত সাতগুষ্টির পরিচয়ে আবশ্যক কি?" তারপর তিনি একটু উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "এখানে এ সব কথার আবশ্যক নেই, এখানকার এ ভাব নয়। ঠাকুরকে শ্রদ্ধা ভক্তি ক'রবো! সাধন ভজন ক'রবো! মাতুল আশ্রম, পিসের আশ্রম—এসব কথার কি আবশ্যক? স্বভাব, কুলীন বা ভঙ্গ—এসব কি দরকার?" এই বলিয়া তারকদা উত্তেজিত হইয়া বেশ দু'চারটা ধমকও দিলেন। সকলেই তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন। আমি মনে মনে বলিতে লাগিলাম,—'তারকদা যথার্থই তেজী পুরুষ, যথার্থই সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীর আদর্শ তিনি ঠিক রাখেন!' আমি মনে মনে খুব খুসী হলুম।

অভিমানশূন্য তারকদা—

শীতকালে, বড়দিন বা নূতন দিন উপলক্ষে ঠাকুরের এক

বিশেষ ভোগ দেওয়া হয়। দুপুরবেলা উঠানে সকলে খাইতে বসিয়াছেন, দালান আর উঠানের মাঝখানে যে জমিটা সেখানে সকলে জুতা ছাড়িয়া রাখিয়াছেন। তখনও প্রায় শতাবধি লোক দাঁড়াইয়া আছেন, বসিবার স্থান পাইতেছিলেন না। সকলেই বলিতে লাগিলেন যে, ঐ জায়গাটার জুতাগুলি সরাইলে ভক্তেরা বসিতে পারেন। সকলেই এই কথা বেশ চেঁচাইয়া বলিতে লাগিলেন; কেহই উঠিয়া নিজের নিজের জুতা সরাইলেন না—মুখে সকলেই আদেশ করিতে লাগিলেন। তারকদা স্বভাব সুলভ বালক ভাবে কহিতে লাগিলেন, "ঠিক'ত! ঠিক'ত! জুতাগুলি সরাইলে এঁদের'ত জায়গা হয়!" এই কথা বলিয়া, কোন দ্বিধা বা সঙ্কোচ না করিয়া সেই জুতাগুলি দুই বাহু ও বক্ষের মাঝে ধরিয়া, দেওয়ালের কোণটাতে রাখিয়া আসিতে লাগিলেন। জুতা উঠাইবার সময় কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, "কি করেন মহাপুরুষ, কি করেন? আমার জুতায় হাত দেবেন না, তিনি বলিলেন, "ওহে! বস, বস—খাও। এই সামান্যর জন্যে এত চঞ্চল হ'বার দরকার নেই, এটা এখনি ক'রে নিচ্চি।" এইরূপ তিন চারিবার করিতেই জায়গাটা পরিষ্কার হইয়া গেল। পরে নিজে একটা ঝাঁটা আনিয়া ঝাঁট্ দিলেন। তারপর সকলকে নিজ নিজ আসন আনিয়া বসিতে বলিলেন। যাঁহারা আহারের জন্য উঠানের মাঝে বসিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে

বলিলেন, "হাঁ! মহাপুরুষ বটে! কোন মান, অভিমান নাই।" এই উপখ্যানটীতে তাঁহার একটী বিশেষ মনোভাবের চিত্র পাওয়া যায়। যিনি উপস্থিত সকলের গুরু বা গুরুস্থানীয় তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে সকলের জুতা দুই বাহু ও বুকের মাঝে রাখিয়া সরাইলেন—কোনই সঙ্কোচ করিলেন না! তিনি আদেশ করিলে উপস্থিত যে কোন ব্যক্তি জুতা সরাইত, কিন্তু তিনি এত বিনয়ী ও অভিমানশূন্য লোক ছিলেন যে, এসব বিষয়ে কোন প্রাধান্য বা ইতর বিশেষ ভাব তাঁ'র একেবারেই মনে আসিত না। যথার্থই তিনি সাধু ও মহাপুরুষ ছিলেন। "অভিমানশূন্য গোরা নগরে বেড়ায়!"

Christmas বা খৃষ্টের আবির্ভাব উৎসব—

বরানগর মঠে প্রতি বৎসর Christmas বা খৃষ্টের আবির্ভাব উৎসব পালন করা হইত। বেলুড় মঠে প্রথম কয়েক বৎসর তাহা বন্ধ হইয়াছিল অর্থাৎ কেহই সে বিষয়ে মনোযোগ করেন নাই। তারকদা সে সময়ে বাহিরে ছিলেন। কয়েক বৎসর পর ফিরিয়া আসিয়া, তিনি আমাকে এই অমনোযোগীতার জন্য একটু বকিলেন,—"কেন এ প্রথা বন্ধ হয়েছে?" আমি বলিলাম, "এ বিষয়ে কাহারও আগ্রহ ছিল না, সেই জন্য হয়নি।" তিনি বলিলেন, "কেন, তুমি তো উপস্থিত ছিলে? প্রথম থেকেই তো তুমি জান? এরা না জানতে পারে;

তুমি এ কাজটা কেন বন্ধ কর্‌লে?" এইরূপ ভাবে আমাকে দু'একটা কথা বলিলেন। তারপর উঠানে ঠাকুর-ঘরের নীচেতে, যেখানে কাঁটাল গাছটা ছিল সেইখানে রাত্রে ধুনি জ্বালিয়ে বাইবেল পাঠ ও যীশুর জন্ম বিষয়ে কিছু কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। যীশুর উদ্দেশ্য করিয়া ঠাকুরকে ভোগ দেওয়া হইল ও প্রণামাদি করা হইল। তারকদা এই কার্য্যে আচার্য্য হইয়াছিলেন। সকলেই একটা ভক্তি সহকারে এই অনুষ্ঠানটী প্রতিপালন করিয়াছিলেন।

তারকদা বলিতে লাগিলেন, "বরানগর মঠের সময়ে, একবার সকলে মিলে আঁটপুরে গিয়েছি। শীতকাল, রাত্রে ফাঁকা বাড়ীর উঠানে ব'সে একটা ধুনি জ্বালা হ'ল। সকলে ধুনির চারিদিকে বসা গেল। স্বামিজী বাইবেল পাঠ কর্‌তে লাগ্‌লেন এবং যীশুর বিষয় নানা কথাবার্ত্তা কইতে লাগ্‌লেন। সেই সময় ভাবটা বেশ জমে গিছ্‌ল। আশ্চর্য্যের বিষয়, জানা গেল—সত্য সত্যই সেইদিন খৃষ্টমাস!" তারপর থেকে, সারদা মহারাজ (স্বামী ত্রিগুণাতীত) বরানগর মঠে এই অনুষ্ঠানটী অল্পবিস্তর করিতেন। তিনি খৃষ্টীয় সিদ্ধ-মহাপুরুষ-দিগের, অরহত বা সন্তদিগের চিত্র আনিয়া দেওয়ালে রাখিয়া-ছিলেন। এইরূপে এই অনুষ্ঠানটী এখনও পর্য্যন্ত অল্পবিস্তর চলিয়া আসিতেছে। যাহা হউক, তারকদা এ বিষয়ে বেশ উৎসাহী ছিলেন। এই কার্য্যের ভিতর বেশ দেখা যায় যে,

তারকদার কি একটা উদার ভাব ছিল। দলাদলি, সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণ ভাবটা তাঁ'র ভিতর একেবারেই ছিল না।

বুদ্ধ পূজা—

বৈশাখী পূর্ণিমার রাত্রে বেলুড়মঠে তারকদা কয়েকবার বুদ্ধোৎসব করিয়াছিলেন। এইরূপ কথিত আছে যে, বৈশাখী পূর্ণিমাতে ভগবান্ বুদ্ধের জন্ম, সিদ্ধিলাভ ও তিরোভাব হইয়াছিল। তারকদা মঠের উঠানটীতে বসিয়া সকলকে সমবেত করিয়া বুদ্ধের বিষয় আলোচনা ইত্যাদি করিতেন। ভগবান্ বুদ্ধের স্মৃতির প্রতি সম্মান দেখানই এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল।

"৺গঙ্গাপূজার চেয়ে মানুষ পূজা বড়"—

একদিন গরমীকালে, সম্ভবতঃ ৺গঙ্গাপূজার কোন একটা বিশেষ দিন ছিল, অনেকেই বেলুড় মঠের ঘাটে স্নান করিতে-ছিল। গঙ্গার জলটা তখন অৰ্দ্ধেক সিঁড়ি পর্য্যন্ত হয়েছে। বেলা সাড়ে দশটা এগারটার সময় তারকদা ঠাকুরঘরে পূজা শেষ ক'রে পুষ্পপাত্র নিয়ে ৺গঙ্গাপূজা করিতে এলেন। এক ব্যক্তি গঙ্গার ঘাটে সিঁড়ির কাছে জলে ভাসিতেছিল। তারকদা প্রশান্ত মুখে আসিয়া, বেশ ভক্তি সহকারে ৺গঙ্গাপূজা করিলেন। ফুল, বিল্বপত্র ইত্যাদি জলেতে না ফেলিয়া জলস্থিত ব্যক্তির মাথার উপর ফেলিতে লাগিলেন। অবশ্য সেই ব্যাক্তি শঙ্কিত ও

উদ্বিগ্ন হইয়া অনেক অনুনয় সহকারে নিষেধ করিতে লাগিল। তারকদা অতি গম্ভীর ভাবে, যেমন ৺গঙ্গাপূজা করিতে ছিলেন তেমনি করিতে লাগিলেন এবং ফুল ও বিল্বপত্র গঙ্গার জলে না ফেলিয়া জলস্থিত ব্যক্তির মাথায় ফেলিতে লাগিলেন। অবশেষে দু'টা রসগোল্লা থালায় রহিল। তারকদা ৺গঙ্গাকে নিবেদন করিয়া জলস্থিত ব্যাক্তিকে বলিলেন, "হাঁ কর!" সে হাঁ করিলে, তারকদা টিপ্ করিয়া তা'র মুখে সেই রসগোল্লা দু'টা ফেলিয়া দিলেন। তারপর তারকদা পূজা সমাপ্ত করিয়া সিঁড়ির উপরে দাঁড়াইলে, জলস্থিত বাক্তি তাঁহার পায়ে হাত দিয়া অতি ভক্তিভরে প্রণাম করিল এবং বলিতে লাগিল, "আপনি কি কর্‌লেন? এতে যে আমার অপরাধ হ'বে!" তারকদা তা'র উত্তরে, দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের দিকে মুখ ক'রে, অতি গম্ভীরভাবে একটী কথা বলিলেন, "ওহে! ৺গঙ্গাপূজার চেয়ে মানুষ পূজা বড়!" এই কথাটী তিনি এমন স্নিগ্ধ, গম্ভীর ও শান্তভাবে বলিয়াছিলেন যে ইহার বহুবিধ অর্থ হয়।

এতাবৎকাল ভারতবর্ষে মন্দির, বিগ্রহ ও তীর্থ পূজা হইয়া আসিতেছে। এই ব্যাপারে সমস্ত ভারতবর্ষে কোটী কোটী টাকা ব্যয়িত হইয়াছে ও হইতেছে। ইহা নিশ্চয় ভক্তির নিদর্শন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু নিকটবর্ত্তী স্থলে যদি কোন ব্যক্তি বিপন্ন হয় ও অন্নক্লিষ্ট হয়, তাহার

দিকে কেহই চাহিয়া দেখে না। প্রশ্ন করিলে উত্তরে বলে, "ওর প্রাক্তন কর্ম্মফল ভোগ কর্‌ছে। তা'তে আর কে কি কর্‌বে বল?" কেহ বা বলেন, "অদৃষ্টে যা লেখা আছে তা' আর কে খণ্ডন কর্‌বে বল? নিজের কর্ম্মফলে নিজে ভুগছে, এতে অপরে আর কি কর্‌বে বল? সুকর্ম্ম কর্‌লে সুখী হ'ত—দুষ্কর্ম্ম করেছে দুঃখ ভোগ কর্‌ছে।" এইটি হইল সাধারণ লোকের ভিতর প্রচলিত মনোভাব। ঠাকুর দেবতার প্রতি যথার্থই শ্রদ্ধা ভক্তি আছে; কিন্তু মানুষের প্রতি ভালবাসায়—সে প্রাণ একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে—অযথা দার্শনিক মত উদ্ধৃত করিয়া নানারূপ শুষ্ক তর্ক বিতর্ক করেন। এই হইল জনসাধারণের ভিতর ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রচলিত মনোভাব।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ হইতে ভারতবর্ষে অপর এক ভাবস্রোত প্রবাহিত হইল। এই ভাবটী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের বা স্বামী বিবেকানন্দের অথবা স্বামী শিবানন্দের মুখ হইতে নির্গত হউক—এ বিষয়ে কোন বিচার করিতেছি না; কিন্তু এইমাত্র বলিতেছি যে, নব এক ভাবের স্রোত উদ্ভূত হইল। এই ভাবটী হইল—"৺গঙ্গাপূজার চেয়ে মানুষ পূজা বড়।" অর্থাৎ মানুষের সেবা করা, মানুষের উপকারের জন্য চেষ্টা করা, মানুষের দুঃখের জন্য অশ্রুবিসর্জ্জন করা ইত্যাদি। ইহা করিলে ঈশ্বর পূজার ফল পাওয়া যায়। এ স্থলে দেবদেবীর পুজা বন্ধ করা বা অবজ্ঞা প্রদর্শন করা উদ্দেশ্য নয়। দেবদেবীর পুজা করা সাধন মার্গের এক আবশ্যকীয়

সোপান; কিন্তু এই পূজার সহিত প্রাণটাও সরস রাখা আবশ্যক। মানুষকেও ঠিক সেই চক্ষে দেখা উচিত অর্থাৎ সর্ব্বজীবে নারায়ণ আছেন এবং মানুষের ভিতর সেই নারায়ণ বহুল প্রকারে বিকাশ পাইতেছেন—এই জ্ঞানটী উপলব্ধি করিয়া মানুষের সেবা করিতে হইবে। এ স্থলে স্বামীজি যাহা বলিয়াছিলেন—কৃপা করা, দয়া করা—এ ভাব নয়; কারণ তাহাতে অপরকে হীন করা হয়; কিন্তু নারায়ণ জ্ঞানে অপরকে সেবা করা—ইহাই হইতেছে প্রশস্ত পন্থা।

নিরভিমানী হইয়া, আত্মভোগ বিস্মৃত হইয়া, মানুষকে নারায়ণ জ্ঞানে সেবা করা—এইটীই হইল নবভাব। এই ভাবই হইল রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাণশক্তি, বীজ মন্ত্র—বাণী। এইজন্য, মহাপুরুষ শিবানন্দ স্বামী নিশ্চল ও গম্ভীরভাবে বলিয়াছিলেন—"৺গঙ্গাপুজার চেয়ে মানুষ পূজা বড়।" এই বাণীটার কি গভীর অর্থ আছে তাহা বহু চিন্তা করিলে বুঝা যায়। এই বাণীটা বিশেষ করিয়া উপলব্ধি করিবার বস্তু। এই বীজ মন্ত্র রামকৃষ্ণ মিশনে প্রাণ সঞ্চার করিতেছে এবং বহুকাল ধরিয়া এই বীজ মন্ত্রের শক্তি রামকৃষ্ণ মিশনকে নানাভাবে প্রসারণ করিবে। এই ভা । রামকৃষ্ণ মিশন জগতকে নূতনরূপে দেখাইতেছে। পূর্ব্বে ← ভাব যে ছিল না এ কথা বলিতেছি না; কারণ কোনও ভাবই নূতন বলা যায় না—সবই পুরাতন। তবে রামকৃষ্ণ মিশন জীবন্ত ভাবে, প্রাণ দিয়া,

শরীরের রক্ত দিয়া এই ভাবটীকে প্রাণবন্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে। এইজন্য বলিতেছি, এই ভাবটী রামকৃষ্ণ মিশনের বাণী।

পুণ্যশ্লোক স্বামীজির বাণী—

বুদ্ধের জীবনের উদ্দেশ্য ছিল—"জাতি, জরা, দুঃখ, মরণ বন্ধ করিব" এবং "অনুত্তর সম্যক্ সম্বুদ্ধ হইব" অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জাতি বা জন্ম, জরা, দুঃখ, মরণ—কিরূপে নিবারণ করা যায়, সকলের জন্য তাহার উপায় উদ্ভাবন করিব এবং পূর্ণ পরাজ্ঞান লাভ করিব।

স্বামীজি যখন পরিব্রাজক অবস্থায় সমস্ত ভারতবর্ষ নগ্নপদে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার ভিতর হইতে এই ভাবটী জাগিয়া উঠিয়াছিল :—

লক্ষ্যহীন ভ্রমি ধরা মাঝে,
উত্তাল তরঙ্গরাশি গ্রাসিছে জগৎ,
হাহাকার সদা উঠে রোল,
মর্ম্মভেদী পশিছে হৃদয় মাঝে,
নাহিক নিস্তার—কে আছ মানব
নিবার তরঙ্গরাজি।

বুদ্ধের জন্ম, জরা, দুঃখ, মরণ এবং অনুত্তর সম্যক্ সম্বুদ্ধি লাভ করার ভাবটীর সহিত স্বামীজির ভাবটীর বিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে। স্বামীজি এবং তাঁহার সহ-কর্ম্মীদের ভিতর

এই ভাবটী অন্যরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল—'শিবজ্ঞানে জীব-সেবা করিব, বহু প্রকারে জীবের সেবা করিয়া জীবের কষ্ট লাঘবের প্রয়াস করিব এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিব বা ব্রহ্মত্ব পাইব।'

"ঠাকুর" ও বরানগর মঠের তপস্যার একত্রিত শক্তি—

তারকদা একটী কথা সর্ব্বদাই বলিতেন, "ঠাকুর অবশ্য খুব শক্তি রাখিয়া গিয়াছেন; কিন্তু বরানগর মঠ হইতে এ পর্য্যন্ত তপস্যার ফলে আরও শক্তি সঞ্চয় হইয়াছে। এই দুই শক্তি সমবেত ও একত্রিত হইলে মহতী শক্তির প্রাদুর্ভাব হইবে।" কথাটা অতীব সত্য। ঠাকুরের তপস্যার শক্তি এবং বরানগর মঠ হইতে আজ পর্য্যন্ত সকলের তপস্যার শক্তি একত্রিত হইলে অতীব তেজপুঞ্জ শক্তিরাজি সমুদ্ভূত হয়, এ বিষয়ে কোন তর্ক যুক্তি করিবার নাই।

প্রাচীর দ্রষ্টা (Chinese wall gazer)—

একদিন সন্ধ্যার পর, গঙ্গার ধারের বড় বারাণ্ডাতে বেঞ্চির উপর বসিয়া তারকদা'র সহিত কথা হইতে লাগিল। আমি বলিলাম, "ইংরাজ লিখিত এক বৌদ্ধ গ্রন্থে আছে যে, বৌদ্ধদিগের দশম বা শেষ মহাস্থবীর ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হইয়া চীনদেশে বাস করেন। তিনি সর্ব্বদাই একদৃষ্টিতে দেওয়ালের দিকে চাহিয়া থাকিতেন। চীনেরা

বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে "দেওয়াল চাওয়া লোক" বলিত এবং এই বিষয় লইয়া অনেক ঠাট্টা তামাসা করিত।" তারকদা বলিলেন, "ইহা এক প্রকার ত্রাটক। সর্ব্বদা একদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিলে মন খুব স্থির হইয়া যায় এবং উচ্চাঙ্গের ধ্যান হইয়া থাকে।" এইরূপে ত্রাটকের বিষয় নানা কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল এবং ত্রাটক যে ধ্যানের অঙ্গ ইহাও তিনি বেশ বুঝাইলেন।

পূর্ব্বে কলিকাতায় সূর্য্যের দিকে চাহিয়া উদয় অস্ত জপ করার প্রথা ছিল। সূর্য্য উদয় হইতে অস্ত যাওয়া পর্য্যন্ত এক পায়ে দাঁড়াইয়া সূর্য্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অনেক জাপক জপ করিতেন। ইহাও সেই ত্রাটকের অন্তঃর্ভূক্ত।

সন্ন্যাসী কয় প্রকার—

বৌদ্ধগ্রন্থ "মিলিন্দ উপাখ্যানে" উল্লেখ আছে যে, বুদ্ধ ঘোষ কাবুলের গ্রীক্ রাজা মিলিন্দ বা মিয়াণ্ডারের সভায় যান। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা সন্ন্যাসী হন কেন? সন্ন্যাসী কয় প্রকার?" বুদ্ধ ঘোষ উত্তরে বলিলেন, "অধিকাংশ লোক অকর্ম্মণ্য, কাজ কর্ম্ম না করিবার জন্য শ্রমের ভয়ে সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করে; আহার ও বাসস্থান অনায়াসে পাইবে এই উদ্দেশ্যে তাহারা সন্ন্যাসী হয়। ইহাদের সংখ্যা বহুল। বৃদ্ধ বয়সে কে শুশ্রূষা করিবে এবং কেই বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

করিবে এই ভাবিয়া অনেকে বৃদ্ধ বয়সে সন্ন্যাসী হয়। ইহার সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প। আর জনকয়েক মাত্র ধর্ম্ম লাভ হেতু বা ভগবৎ জ্ঞান লাভের জন্য সন্ন্যাসী হইয়া থাকে। এই অল্প সংখ্যকের পুণ্যবলে অপর সাধারণ সন্ন্যাসী সকল সমাজে প্রচলিত হইয়া যায়। সমাজ বহু সংখ্যককে এই কয়জনের নিমিত্ত শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া থাকে। এই হইল তিন শ্রেণীর লোক—যাহারা সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া থাকে।"

তারকদা শুনিয়া বলিলেন, "ঠিক বলেছ! এখনও এইজন্য ভারতবর্ষে বহু লোক সন্ন্যাস নিয়ে থাকে এবং আজও পর্য্যন্ত এই তিন শ্রেণী বা বিভাগ দেখা যায়।" এই বলিয়া তিনি আরও অনেক কথা বলিতে লাগিলেন।

আমাশয়ে ভোগা—

একবার আড়াই বা তিন বৎসরকাল তারকদা বড় আমাশয়ে ভুগিয়াছিলেন। অসুখটা কিছু বাড়াবাড়ি হইয়াছিল। সকালে মাত্র একখানি বেলের মোরব্বা বা কুমড়ার মেঠাই খাইয়া জল খাইতেন। বেলা এগারটার সময়, একটি ছোট মাটির হাঁড়িতে কাঠের জ্বালে রান্না, পুরাণ চাউলের দুটি ভাত, আর ডুমুর কাঁচকলা দিয়ে একটু ঝোল খাইতেন। কখনও বা ঝোলে কিছু, মৌরলা মাছ থাকিত, কখনও বা দু' ডুমি কাঁচকলা ভাতে আর একটু সাঁজপাতা দৈ দিয়া খাইতেন। সকালে ও সন্ধ্যার

সময়, এই একই প্রকার খাওয়া তিনি আড়াই বৎসর, তিন বৎসর খাইয়াছিলেন। সেই সময়ে মঠে রাখাল মহারাজ উপস্থিত ছিলেন। ভক্তেরা ঠাকুরের ভোগের জন্য নানাবিধ উৎকৃষ্ট খাদ্য দ্রব্যাদি আনিতেন এবং সর্ব্বদাই ঠাকুরের ভোগ ও উৎসব হইত; কিন্তু তারকদা কখনও সে সব জিনিষ আহার করিতেন না। বিশেষ উৎসব হইলে তিনি ঠাকুরের প্রসাদ জ্ঞানে চিমটি করিয়া একটু প্রসাদ তুলিয়া লইয়া জিহ্বায় ঠেকাইতেন; কিন্তু আহার করিতেন না। আমি একদিন তারকদাকে বলিলাম, "ধন্য তোমার জিহ্বা সংযম! গাড়ী গাড়ী উৎকৃষ্ট জিনিষ সুমুখ দিয়ে চলে যাচ্চে, কিন্তু কখনও তা'র একটুও আহার কর্‌লে না? ধন্য তোমার জিহ্বা সংযম! ধন্য তোমার মন সংযম!" তারকদা বলিলেন, "ওহে! সাধু হওয়া পর্য্যন্ত এইরকম নানা কঠোর সংযম ক'রে আস্‌ছি। এইজন্য, এতে আর বিশেষ কিছু আসে যায় না। সামান্য মাত্র আহার করে থাকা অভ্যাস হ'য়ে গেছে।" তারকদা এ বিষয়ে আর বিশেষ কোন কথাবার্ত্তা বলিলেন না। এইরূপ জিহ্বা সংযত ব্যক্তি বা চিত্ত সংযত ব্যক্তি জগতে খুব কম দেখিতে পাওয়া যায়। আহার বিষয়ে তিনি নিতান্ত মিতাচারী ছিলেন। আমি দেখিয়াছি যে, তিনি আজীবন অল্পমাত্র ও নিয়মিতভাবে আহার করিতেন। পাতে নানারকম খাদ্য দ্রব্যাদি সাজাইয়া দিলেও, নিজের নিয়মিত পরিমাণ আহারের একটু

মাত্র ব্যতিক্রম না করিয়া, তিনি খাদ্য দ্রব্যাদি সকল অঙ্গুলি দিয়া স্পর্শ করিয়া জিহ্বায় ঠেকাইতেন। এইরূপ আর দ্বিতীয় ব্যক্তি আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। যেন দেহ ধারণের জন্য আহার করিতেন, ভোগের জন্য নহে। তিনি যে দ্রব্যাদির রস বা স্বাদ বুঝিতেন না একথা নহে, তিনি এ সবই বুঝিতেন; কিন্তু তিনি অতিশয় সংযত পুরুষ ছিলেন। এইটাই তাঁ'র বিশেষত্ব ছিল। সর্ব্বদাই যেন দেহ হইতে মনকে পৃথক্ করিয়া রাখিতেন.

ধ্যানী—কিন্তু কীর্ত্তনী নহে—

মঠের উঠানে উৎসব উপলক্ষে বা বিভিন্ন সময়ে নানা-প্রকার কীর্ত্তনাদি হইত। অনেকেই কীর্ত্তনে যোগ দিয়া উদ্দাম নৃত্য করিতেন; কিন্তু তারকদা ভিতরকার দালানে বড় বেঞ্চিটীতে স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতেন, কখনও কীর্ত্তনে যোগ দিতেন না। তিনি যে কীর্ত্তন বা অন্যপ্রকার ভাবের বিরোধী ছিলেন তাহা নহে। কোন বিষয়ে তিনি নিবারণ বা হস্তক্ষেপ করিতেন না অর্থাৎ পরের ভাব নষ্ট করিতেন না। তিনি নিজে স্বাভাবিক ধ্যানী পুরুষ ছিলেন—এইজন্য, নিজের ভাবে নিজে থাকিতেন—কীর্ত্তনে যাইয়া মাতিতেন না।

তাহার সমস্ত জীবনটা পর্য্যালোচনা করিলে এইটি দেখিতে পাওয়া যায় যে, ধ্যানী ভাবটী তাঁহার স্বভাব সুলভ। এইজন্য

বাল্যকালে তাঁহার বিশেষ কিছু বিদ্যা অভ্যাস হয় নাই। পরে যখন চাকরী করিতে যান তখনও তাঁহার আফিসের কার্য্যেতে বিশেষ মন যায় নাই; কিন্তু যখন গৃহস্থ আশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন তখন তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ধ্যানী ভাবটী প্রস্ফুটিত হইল। তিনি যেন তখন নিজের ক্ষেত্রে বা লোকে আসিতে পারিলেন।

ধ্যান বহু প্রকার আছে। সব সময় যে উচ্চমার্গের ধ্যান হইবে এ কথা নয়। মোটামুটি বুঝিতে হইলে, জগৎ হইতে মনকে বিচ্যুত করিয়া লওয়াই হইল "ধ্যান"; যাহাকে চলিত কথায় বলে "অনাসক্ত ভাব"। জগতটা যেন একটা জীবন্ত চিত্রের ন্যায় সম্মুখে প্রধাবমান হইতেছে—ইহাকে নিজে দ্রষ্টা বা সাক্ষী হইয়া দর্শন করিতে হইবে। এইটি হইল ধ্যানের লক্ষণ। এই ভাব অবলম্বন করিয়া বহুবিধ উচ্চভাব পাওয়া যায়। জগৎ হইতে নিজেকে যেমন পৃথক্ বা বিচ্যুত করা হইল তেমনই দেহ হইতেও মন ধীরে ধীরে পৃথক্ বা বিচ্যুত হইয়া গেল। কারণ সেই অবস্থায় দেহও জগতের অংশ হইয়া যায় এবং মন হইতেও অহং পৃথক্ হইয়া যায়। দেহটা স্বয়ং নহে; কিন্তু দেহটা বাহ্যিক বস্তু। উদাহরণ স্বরূপ এস্থলে বলা যায় যে, "ষষ্ঠী বিভক্তি সাময়িক সম্বন্ধে", যথা—আমার দেহ—আমি দেহ নই; আমার মন—আমি মন নই; আমার পুণ্য—আমি পুণ্য নই; আমার মুক্তি—আমি মুক্তি নই; আমি স্বতন্ত্র

ও গুণাতীত। সাময়িকভাবে এই সকল গুণের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়াছি। এই হইল ধ্যানের বিভিন্ন সোপান। এতদ্ব্যতীত আরও বহুপ্রকার ধ্যান আছে; কিন্তু জগতকে নিরপেক্ষভাবে দর্শন করাই ধ্যানের প্রথম ও প্রধান সোপান। আজীবন কাল আমি তারকদাকে দেখিয়াছি যে, তিনি জগৎ হইতে সব সময় যেন পৃথক্ বা বিচ্যুত রহিয়াছেন। এইটীই তাঁহার স্বাভাবিক ভাব ছিল। এই জন্যই বোধ হয় জীবনের প্রথম অবস্থায় তিনি বিশেষ কিছু কার্য্য করিতে পারেন নাই এবং সকলে তাঁহাকে যতটা উচিত ততটা শ্রদ্ধা করে নাই। কিন্তু জীবনের শেষভাগে যখন এই ভাবটী ঘনীভূত হইয়া বেশ প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল তখন তাঁহাকে সকলেই—জীবন্মুক্ত পুরুষ বলিয়া সম্মান করিতে লাগিল। যাহা হউক, তিনি সকল ভাবই বুঝিতেন, সকল ভাবকেই শ্রদ্ধা করিতেন, কোন ভাবের বিরোধী ছিলেন না। তবে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ধ্যানী ভাবটী তাঁহার প্রিয় ছিল—এই মাত্র। এইজন্য, তিনি তাণ্ডব নৃত্যে বা অন্য প্রকার ভাবেতে ততটা মিশিতেন না, দূর হইতে সমস্ত দেখিতেন। তিনি ধ্যানী ছিলেন—কীর্ত্তনী ছিলেন না।

স্বাধীন চিন্তাশীল সাধক শিবানন্দ—

শিবানন্দ স্বামীর ভিতর একটী বিশিষ্ট ভাব দেখিতাম যে তিনি অপরের অনুকরণ করা মোটেই পছন্দ করিতেন না।

এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিলে তাহার হাত, মুখ, মাথা ইত্যাদি অঙ্গের সঞ্চালন নকল করিতে পারে, কিন্তু তাহার আভ্যন্তরিক উচ্চ ভাব সকল কখনও অনুকরণ করিতে পারে না। বরানগর মঠে ও কাশীপুরের বাগানে হরিশ যেমন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকে অনুকরণ করিয়াছিল! স্বামী শিবানন্দ বলিতেন, "নিজের ব্যক্তিত্ব (Individuality) বজায় রেখে সাধন ভজন ক'র্‌বে। অপরকে শ্রদ্ধা ক'র্‌বে, কিন্তু নিজের ব্যক্তিত্ব কখনও নাশ কোরো না। তাহ'লে কিছুই হ'বে না। যে যে পরিমাণে ব্যক্তিত্ব রেখে সাধন ভাজন ক'র্‌বে তা'র সেই পরিমাণে উন্নতি হ'বে।" সাধারণ ভক্তেরা বা অনুকরণশীল ভক্তেরা ইহাকে অহঙ্কার ভাবিয়া বিভীষিকাগ্রস্থ হয়! কিন্তু ইহা অহংঙ্কার নয়—অহং জ্ঞান (Not Egotism but Egoism)। ইহাতে শ্রদ্ধা-ভক্তি কম বা বেশী—ইহার কথাই আসে না। শ্রদ্ধা-ভক্তি অটুট্ রাখিয়া নিজের স্বতন্ত্রভাব উদ্ভূত করিতে হয়। অনুকরণশীল ব্যক্তি অল্প দিনের জন্য লোকরঞ্জক হয়। কিন্তু নিজের কোন ব্যক্তিত্ব না থাকায় অল্পদিন পরে কাহারও নিকট সম্মান বা শ্রদ্ধা পায় না। বিদ্রূপের ভাষায় যাহাকে বলে কলের গান বা গ্রামোফোন্ রেকর্ড মাত্র—অনুকরণশীল ব্যক্তি তাহাই, নিজের কিছু চিন্তা করিবার নাই বা কিছু বলিবার থাকে না। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ এই অনুকরণশীলতাকে ভীষণরূপে অপছন্দ করিতেন। তিনি ইহাকে "একঘেঁয়েমি"

বা "গোঁড়ামি" বলিয়া উল্লেখ করিতেন। এই অনুকরণপ্রিয়তাকে লক্ষ্য করিয়াই তিনি তাঁহার গভীর ভাবপূর্ণ সরল ভাষায় সময় সময় বলিতেন, "গুরু মুতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তো চেলা মুতে পাক দিয়ে দিয়ে! কিরে শালারা! তোরাও কি এই ক'র্‌বি না কি?" এই ভাবের তাঁহার আরও অনেক উক্তি আছে। স্বামী শিবানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকে নিরতিশয় শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন, কিন্তু তিনি কখনও নিজের ব্যক্তিত্বের অপলাপ করেন নাই। তাঁহাকে দেখিলে বেশ স্পষ্ট বুঝা যাইত যে, তাঁহার নিজের কিছু বলিবার ও করিবার আছে—He had a mission in his life এবং সেই জন্যই তিনি দেহ ধারণ করিয়াছেন। মোট কথা, স্বামী শিবানন্দ তাঁহার স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে অটুট রাখিয়া জীবনধারা প্রবাহিত করিয়াছিলেন। তিনি সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র, স্বাধীন চিন্তাশীল সাধক ছিলেন। ইহাই সকলের আদর্শ হওয়া উচিত। অনুকরণ করিলে সাধকের বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে।

কুকুরকে ভালবাসা—

বরানগর মঠ হইতে দেখিয়া আসিয়াছি যে, তারকদা বড় কুকুর ভালবাসিতেন। কুকুর নিয়ে যে খেলা করা বা গায়ে হাত বুলান তা' নয়; কিন্তু—তিনি কুকুরকে খাওয়াতে বড় ভালবাসিতেন ও আনন্দবোধ করিতেন।

তিনি আশৈশব আনন্দময় পুরুষ। জগৎটা যে কষ্টের জায়গা তিনি অতটা দেখিতেন না। জগতটা যে আনন্দে পরিপূর্ণ—এইটাই তিনি দেখিতেন। তাঁহার কথাবার্ত্তা, চাল চলন সবেতেই প্রকাশ পাইত যে, তিনি জগৎটা যেন আনন্দে পরিপূর্ণ এইটাই দেখিতেছেন এবং এইজন্য তিনি নিজেও সব সময়েই আনন্দে থাকিতেন। দুঃখ, কষ্ট, অভাব বা শরীরের ক্লেশ এ সব বিষয়ে তিনি তত মন দিতেন না। কষ্টকে কষ্ট ব'লে মনে করিতেন না। সব সময়ে তাঁর হাসিমুখ। সব সময়ে তিনি আনন্দে পরিপূর্ণ। বিষণ্ণভাব, কি শোকার্ত্তভাব তাঁর মুখে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যাইত না। এই জন্য, তাঁহার কাছে যাইলে লোকে একটা আনন্দ অনুভব করিত এবং দুঃখ কষ্ট ভুলিয়া যাইত।

যাহা হউক, তারকদার একটা কুকুর সঙ্গের সাথী চাই। বরাবরই তাঁর একটা কুকুর রাখার স্বভাব ছিল। বিলাতী কুকুর নয়—নেড়ীকুকুর রাখিতেন। বরানগর মঠে কুকুর ছিল না; কিন্তু ঐ রকম কষ্টের অবস্থাতেও "ভোঁদা" শিয়ালকে উপরকার জানালা থেকে ২।৪ খানা রুটী ফেলে দিতেন। আলমবাজার মঠে থাকার সময় তাঁর কুকুর ছিল না; কারণ, সেই কালে তিনি অধিক সময় বাহিরে থাকিতেন, এইজন্য কুকুর রাখেন নি। কিন্তু বেলুড় মঠ হওয়া পর্য্যন্ত তাঁ'র একটা কুকুর থাকিত। পাতেতে যা কিছু থাকবে, সে

সব মেখে ওঁর কুকুরকে দেওয়া চাই। এমন কি মাংসের ছাঁট্ আনিয়া সিদ্ধ ক'রে কুকুরকে খাওয়াইতেন। কাশীতেও এইরূপ একটা কুকুর ছিল। কন্‌খল সেবাশ্রমেও একটা কুকুর ছিল। আমার মনে হয় ৺তারকেশ্বরের মানস করে জন্মেছিলেন ব'লে, সেইজন্য ভৈরবের বাহন কুকুর একটা তাঁ'র সঙ্গে থাক্‌ত! আমি অবশ্য এটা কৌতুকের ছলে বল্‌ছি!

"সমাধিতে চ'লে যাব"—

তারকদা মাঝে মাঝে বলিতেন, "দেহটার আর কি আছে? যা' কর্‌বার সে ক'রেছে! তবে অকারণে এইটাকে ফেলে দেবার আবশ্যক নেই, যতদিন থাকে থাক্! এজন্য মনকে বিশেষ চঞ্চল কর্‌বার আবশ্যক নেই! দেহটা হচ্চে জপ, ধ্যান, সাধন, ভজন কর্‌বার একটা উপকরণ। সে সব কাজ খুব ক'রেছে; তবে যখন ইচ্ছা হবে, একেবারে সমাধিতে চলে যাব, দেহটা আপনি খসে পড়্‌বে!" একদিন সন্ধ্যার পর ভিতরকার দালানে বসে তিনি এই কথাগুলি এমন গম্ভীরভাবে বল্‌তে লাগ্‌লেন যে, আমি স্থির হ'য়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম। মনে একটা ভয়ও হ'ল—কি জানি কখন শরীরটা ছেড়ে দেবেন!

এখানে বিশেষ ক'রে জানা আবশ্যক যে, যে ব্যক্তি মহাধ্যানী এবং সর্ব্বদাই উচ্চমার্গের ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন,

তাঁহার মনকে দেহেতে নামিয়ে না আন্‌লে দেহেতে বড় যন্ত্রনা হয়। এই ধ্যানের উচ্চভাবটা দূর কর্‌বার জন্যেই তিনি অনেক সময় বালকের ন্যায় হাস্য করিতেন ও চাপল্যভাব প্রকাশ করিতেন। এ কথার আভাষ পূর্ব্বে দু'এক জায়গায় দেওয়া হয়েছে। এজন্য স্বমুখে যা' আস্‌ছে সেইরকম কতকগুলো আবোল তাবোল কথা বলে নিজে খানিকটা হেসে নিয়ে ও অপরকে খানিকটা হাসিয়ে মনটাকে নীচুতে নামাতে চেষ্টা কর্‌তেন। তাহাতে কোন দূষ্যভাব থাকিত না। এই হাসি তামাসার ভিতরেও তাঁর একটা বিশেষত্ব দেখ্‌তুম যে, যদিও তিনি নানা রকম রঙ্গ ভঙ্গী করে নিজে হাস্‌চেন বা অপরকে হাসাচ্চেন, কিন্তু তা' হ'লেও তাঁর মনটা আর একদিকে রয়েছে। মুখে তিনি এক বল্‌ছেন—মন কিন্তু আর এক দিকে। উনি সেটা এমন ভাবে বল্‌ছেন যে তাতেও আর একটা বড় উচ্চভাব রয়েছে। আবার এই রঙ্গ ভঙ্গী কর্‌বার মুহূর্ত্তেক পরেই তিনি গম্ভীর ধ্যানমগ্ন পুরুষ হইয়া যাইতেন; তখন আর পূর্ব্বের সে গলার আওয়াজ নাই, চোখের আর সে চাউনি নাই, মুখের আর সে ভাবও নাই! সহসা এক গভীর ধ্যাননিমগ্ন ব্যক্তির বিকাশ পাইল এবং যাহারা পূর্ব্বে তারকদার চাপল্যের কথা শুনিয়া হাস্য কৌতুক করিতেছিল তাহারাও তারকদার এই আশ্চর্য্য ভাব পরিবর্ত্তন দেখিয়া স্তম্ভিত ও সংযত হইয়া যাইল।

একটী লোককে সেবা করা—

স্বামীজির উৎসবের রাত্রে বহুবাজারের একটী যুবকের বিকাল হইতে ভেদবমি সুরু হইল। মঠে উৎসব, হৈ চৈ ব্যাপার। ইহার ভিতর আবার রোগীর সেবা! কিন্তু তারকদা উৎসবের দিকে তত মন না দিয়া দু'একটী যুবককে লইয়া সেই রোগী ব্যক্তিটীকে উত্তরদিকের ছোট ঘরটীতে আনিয়া গরম জল, বার্লি ইত্যাদি যা' আবশ্যকীয় জিনিষ তাহা নিজে তৈয়ার করিয়া লইয়া সেই রোগীটীর সেবা করিতে লাগিলেন এবং রাত্রি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাকে দেখাশুনা করিলেন। পরদিন সুস্থ হইলে সেই যুবকটী জোড়হাত করিয়া জলভরা চোখে বলিতে লাগিল, "মশাই, এই কর্ম্মবাড়ীর এত গোলমালের ভেতর যে, আপনারা আমার এরূপ সেবা ক'রে প্রাণটা বাঁচালেন, তা আমার স্বপ্নের অগোচর। আমার এ কথা চিরকাল মনে থাক্‌বে। বাড়ীতে এত যত্ন কখনও পাইনি। আমি কি ব'লে আপনাদের কাছে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাব!" এই বলিতে বলিতে যুবকটীর চোখ দিয়া জল গড়াইতে লাগিল। কিন্তু তারকদার পক্ষে এই কাজটা বিশেষ কিছুই নয়—এইটী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ গুণ ছিল। তাঁর প্রাণটা খুব সরস ছিল এবং লোকের প্রতি বেশ ভালবাসা ছিল।

গুরুভাইয়ের প্রতি ভক্তি—

কলিকাতার কোন ভক্ত একদিন তাঁহার বিধবা কনিষ্ঠ-ভগিনীকে লইয়া বলরাম বাবুর বাটীতে রাখাল মহারাজকে দর্শন করিতে যান। এই কনিষ্ঠা ভগিনী 'রাণী' তারক মুখুজ্জ্যের (যাঁহাকে আমরা 'বেলঘরের তারক' বলিতাম) পুত্রবধু। রাখাল মহারাজ এই বিধবা ছোট মেয়েটীকে বড়ই স্নেহ করিতেন এবং কাছে রাখিয়া নানা প্রকার উপদেশ দিতেন। তিনি এ মেয়েটীকে নিজে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং ভক্তটীকে বলিলেন, "তারকদাকে ডেকে আন, তিনি আশীর্ব্বাদ করুন।". তারকদা তখন ভিতরকার দালানে একটা বেঞ্চিতে বসিয়াছিলেন। তিনি বিনীত হইয়া বলিলেন, "মহারাজ যখন নিজেই আশীর্ব্বাদ ক'রেছেন তখন আমার আর যাবার কি আবশ্যক বল?" এই কথা শুনিয়া রাখাল মহারাজ ভক্তটীকে বলিলেন, "না, তারকদাকে এসে আশীর্ব্বাদ কর্‌তে বল।" এই কথা পুনরায় তারকদাকে বলা হইলে তিনি অতি বিনীতভাবে বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ যখন নিজেই আশীর্ব্বাদ ক'রেছেন তখন আমার আর যাবার আবশ্যক কি বল?" রাখাল মহারাজ পুনরায় বলিয়া পাঠাইলেন, "তাকদাকে আস্‌তে বল। আমি আদেশ কর্‌ছি।" এই কথা তারকদাকে জানাইলে তিনি ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিলেন, "মহারাজ যখন আদেশ ক'রেছেন তখন আমি এখনি—যাচ্চি, এখনি যাচ্চি।" এই বলিয়া তিনি

রাখাল মহারাজের সম্মুখে আসিয়া অতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন ও সেই বিধবা মেয়েটীকে বিশেষ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন এবং বেলঘরের তারকের পুত্রবধু জানিয়া পূর্ব্বকথা স্মরণে আসায় তিনি আরও বিনীত হইয়া পড়িলেন। এ কথা জানা আবশ্যক যে মঠেতে গুরুভাইদের ভিতর পরস্পরের প্রতি একটা বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল এবং একের কথা অপরে আদেশবাণী বলিয়া জানিত। গুরুভাইদের ভিতর পরস্পরের প্রতি এইরূপ শ্রদ্ধা-ভক্তি থাকায় রামকৃষ্ণ-মিশনে এইরূপ অসীম শক্তি উদ্ভূত হইয়াছে এবং যত দিন পরস্পরের প্রতি এইরূপ ভালবাসা ও শ্রদ্ধা থাকিবে ততদিন রামকৃষ্ণ মিশন সর্ব্বত্র প্রসারণ লাভ করিবে ও সঙ্ঘ অটুট থাকিবে। এই ভালবাসাই হইতেছে রামকৃষ্ণ মিশনের একটী প্রধান অঙ্গ। দেওভোগের নাগমহাশয় এক সময় বলিয়াছিলেন যে, "হাজার লোকের ভিড় হইলেও রামকৃষ্ণ মার্কা লোক বাছিয়া লওয়া যায়। ইঁহাদের লক্ষণ হইতেছে একটা ভালবাসাপূর্ণ হৃদয় এবং সকলের কাছে বিনয়ী ও শ্রদ্ধাবান্।" নাগমহাশয় যে সকল গুণ ও লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন তাহা খুবই সত্য কথা। কারণ নম্র ও বিনয়ী ভাবটা সেই সময়কার প্রধান অঙ্গ ছিল।

"পরমহংস মশায়"—

একদিন সকাল নয়টা বা সাড়ে নয়টার সময়, যাঁহারা

রামদার বাড়ীতে বা অন্যত্র শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে জন কয়েক বেলুড় মঠের ভিতরের দালানের বড় বেঞ্চিটীতে বসিয়াছিলেন। কথা প্রসঙ্গে আগেকার কথা উঠিল। তারকদাই প্রথমে পূর্ব্বের কথা তুলিলেন। তখন সকলেই "ঠাকুর" কথা ছেড়ে দিয়ে "পরমহংস মশায়" কথাটী ব্যবহার করিতে লাগিলেন। হাওয়াটা এমনি হ'য়ে উঠ্‌ল যে সকলেই যেন সেই পূর্ব্বের সময়ে চলিয়া গিয়াছেন। আমি বলিলাম, "দেখ, পরমহংস মশায় যখন রামদার বাড়ীতে আস্‌তেন, তাঁকে প্রথম দেখতুম তো সাধারণ লোক। তারপর যখন সমাধিস্থ হ'তেন বা উচ্চভাবে চলে যেতেন তখন দেখ্‌তুম যে তাঁর দেহ থেকে যেন একটা আভা বা শক্তি বেরুচ্চে। সেই শক্তিটা যেন ঘরটাকে ভরে ফেল্লে! তারপরে সেই শক্তিটা দুয়ার জানালা দিয়ে বেরিয়ে, রাস্তাতে বেঞ্চি পেতে যাঁরা বসে থাক্‌তেন, তাঁদের যেন স্পর্শ কর্‌তে লাগ্‌ল! বাইরের একটী শক্তি যেন তাঁদের স্পর্শ করিতেছে! প্রথমে প্রত্যেকেই সেটা প্রত্যাখ্যান করিতে চেষ্টা করিতেন; কিন্তু সেই শক্তিটা ধীরে ধীরে চামড়া ভেদ করিয়া যেন ভিতরে ঢুকিত। স্তরে স্তরে যে শক্তিটা ঢুকিতেছে তাহা বেশ টের পাওয়া যাইত। অবশেষে সেই শক্তিটা সেই ব্যক্তিকে অভিভূত করিয়া ফেলিত। এই অভিভূত ভাবটা প্রায় তিন দিন থাকিত, যেন একটা ঘোর ঘোর নেশাতে রহিয়াছে। একজন আর একজনের গায়েতে

এই শক্তির আবরণটা বেশ স্পষ্ট অনুভব করিত; এই জন্য, পরস্পরের উপর এতটা ভালবাসা ও টান হ'ত। আমি এই শক্তি, আভা বা আর যাহাই বল, অনেকবার অনুভব করিয়াছিলাম।" আমি যখন এই কথা বলিতে লাগিলাম, তখন উপস্থিত কয়জন স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। কেউ যেন আর কথা কহিতে পারিতেছিলেন না এবং সকলেই বলিতে লাগিলেন, "অনেক পূর্ব্বকথা স্মরণ হইতেছে। আমরা যেন পুনরায় উহা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি!" সকলেই বলিতে লাগিলেন, "পরমহংস মশায়ের দেহ থেকে এই রকম একটা দেবশক্তি বেরুতো এবং সেটা বহুদূর পর্য্যন্ত ব্যাপৃত হ'ত।" বাবুরাম মহারাজ বলে উঠ্‌লেন, "বাবা! বাঁচ্‌লুম! এই "ঠাকুর" "ঠাকুর" ক'রে ভয়ে মলুম্! আমাদের পুরাণ কথা "পরমহংস মশায়"—এই কথাটা বড় মিষ্টি লাগে, আর তাঁকে নিতান্ত আপনার লোক ব'লে বোধ হয়!" কারণ সকলেই তখন "পরমহংস মশায়" এই কথাটী বলিতেছিলেন। কেহই আর কথা কহিতে পারিলেন না, সকলেই স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ এইভাবে থাকিয়া নীরবে যে যার উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

শুঁড়ীর দোকানে মাতাল দেখিয়া সমাধি—

একদিন তারকদা বলিতে লাগিলেন যে, পরমহংস মশায় কলিকাতা হইতে একটী গাড়ী করিয়া দক্ষিণেশ্বরে যাইতেছিলেন,

সঙ্গে তিনি ও নিরঞ্জন মহারাজ ছিলেন। গাড়ীটা যখন কাশীপুরের শুঁড়ীখানার দিকে আসিয়াছে, তখন পরমহংস মশায় দেখিলেন, শুঁড়ীর দোকানে জন কতক লোক মদ খাইয়া আনন্দ করিতেছে। দেখিবামাত্র পরমহংস মশায় একবারে সমাধিস্থ! একটা পা গাড়ী হইতে বাহির করিয়া পা-দানেতে দিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন। তারকদা ও নিরঞ্জন মহারাজ তাঁহাকে হঠাৎ এইরূপ দেখিয়া ধরিয়া ফেলিলেন। তারকদা বলিতে লাগিলেন যে পরমহংস মশায় বার কতক মুখে ব'লেছিলেন, "আনন্দ কর, আনন্দ কর। আনন্দময়ি! আনন্দ কর।" বাস্ একেবারে সমাধিস্থ! তারকদা বলিতে লাগিলেন, "তখন আমার বয়স অল্প এবং আমি ব্রাহ্ম সমাজের ফের্তা। শুঁড়ীর দোকানকে অতিশয় ঘৃণা কর্তুম। সমাধি কি ব্যাপার তখন অত বুঝিনি। শুঁড়ীর দোকানে মাতালেরা মদ খেয়ে আনন্দ কর্ছে এই দেখে পরমহংস মশায় যে সমাধিস্থ হ'লেন এইটী আমার বড় আশ্চর্য্য লাগ্ল। তখন মনে কর্তে লাগ্লুম, 'এ আবার কি ব্যাপার!' কিন্তু তখন কিছুই বুঝ্তে পার্লুম না যে, 'আনন্দ কর, আনন্দময়ি!'— এই কথাটাতেই পরমহংস মশায় কেন সমাধিস্থ হন?" তারকদা এই বলিয়া নিস্তব্ধ হইলেন।

কাশীর অদ্বৈত আশ্রমে একত্রিত হওয়া—

ইংরাজী ১৯১০ বা ১৯১১ খৃষ্টাব্দে শীতকালে কাশীর অদ্বৈত

আশ্রমে সকলে সমবেত হ'ন। তারকদা, রাখাল মহারাজ ও হরি মহারাজ অদ্বৈত আশ্রমে থাকিতেন। লাটু মহারাজ সোণারপুরায় বংশী দত্তের বাটীতে থাকিতেন। শ্রীশ্রীমাতা ঠাকরুণ এবং মাষ্টার মশায় কিরণ দত্তের বাড়ীতে থাকিতেন। আমি সেই সময় পাঁড়ে হাবেলিতে পারিজাত সেনের বাড়ীতে থাকিতাম এবং সকাল বা বিকালবেলা একবার করিয়া অদ্বৈত আশ্রমে যাইতাম। এই সময়ে কলিকাতা হইতে অনেক ভক্ত আশ্রমে গিয়াছিলেন। অদ্বৈত আশ্রম একবারে গম্‌গমে হইয়া উঠিয়াছিল। এই শীতকালেতে মিসেস্ লেগেট্ (মিস্ ম্যাক্‌লিওডের ভগিনী) কাশীতে উপস্থিত হইলেন। মিসেস্ লেগেটের কন্যা ও তাঁহার জামাতা জর্জ্জ মণ্টেগু (আর্‌ল অব স্যাণ্ডউইচ্)—তাঁহারাও উপস্থিত ছিলেন। মিসেস্ লেগেট ও তাঁহার কন্যা হরি মহারাজকে দেখিয়া পরম আনন্দিত হইলেন; কারণ হরি মহারাজ নিউ ইয়র্কএ তাঁহাদের বাড়ীতে কিছু দিন ছিলেন। তখন মিসেস্ লেগেটের মেয়েটীর বয়স অল্প ছিল। আর একটী মেয়ে আমাকে দেখিয়া মহা আনন্দ করিতে লাগিল। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে বক্তৃতাকালে স্বামীজি ৫৭, সেণ্ট জর্জ্জ ষ্ট্রীটের বাড়ীতে বাস করিতেন। এই বাড়ীটী লেডি মার্গুসনের ছিল। এই মেয়েটী সেই লেডি মার্গুসনের কন্যা। তখন মেয়েটী নিতান্ত শিশু ছিল। মেয়েটী আমার কাছে তা'দের বাড়ীর পুরাণ কথা

শুনিয়া সরল বালিকার ন্যায় আনন্দে হাত তালি দিয়া নাচিতে লাগিল। জর্জ্জ মণ্টেগু (আর্‌ল অব স্যাণ্ডউইচ্) শ্রীশ্রীমাতাঠাকরুণকে অতি শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া প্রণাম করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকরুণকে দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "It is a great privilege to visit such a person."—ইঁহাকে দর্শন করা মহা সৌভাগ্যের কথা।

যাহা হউক, এই সময়ে অদ্বৈত আশ্রমে বহু জনসমাগম হইয়াছিল। আমি সকালে বা বিকালে আশ্রমে যাইলেই তারকদা কাহাকেও বলিয়া তাড়াতাড়ি আমার জন্য একটু চা করাইয়া দিতেন এবং নানা প্রকারে ও বহুমতে আমাকে বিশেষ যত্ন করিতেন। তাঁ'র সেই যত্ন ও ভালবাসার কথা আমার চিরকাল স্মরণ থাকিবে। এ স্থলে জানা আবশ্যক যে, আশ্রমে আগত সকল লোকেরই প্রতি তাঁর বেশ প্রাণখোলা ভাব, যত্ন ও ভালবাসা ছিল। এই সময়ে আশ্রমে যেন একটা মহা আনন্দ উৎসব চলিয়াছিল। পরস্পরের প্রতি কি শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা—ভালবাসার যেন স্রোত বহিত! এতগুলি লোক এক জায়গায় সমবেত হইলেও সকলে যেন এক মন এক প্রাণে থাকিত। এই সময়ে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা বেশ স্মরণ করিতে পারিবেন—প্রাণে প্রাণে বুঝিতে পারিবেন যে, ভালবাসা দিয়া এতগুলি লোককে একটা চাপ বা জমাট করাও সম্ভবপর হ'য়েছিল! ঠিক যেন সমষ্টিটা দেহ এবং তাঁহার

ভিতর এক মন, এক প্রাণ, এক ভাব! এই সময়টা অতি আনন্দে কাটিয়াছিল।

কন্‌খলে যাওয়া—

কাশীতে কয়েক মাস একত্রে থাকিয়া সকলেই ছত্রভঙ্গ হইলেন। মাষ্টার মশায় কিছুদিন বৃন্দাবনে থাকিয়া কন্‌খলে চলিয়া গেলেন। আমি বৃন্দাবন চলিয়া গেলাম। আবার বৃন্দাবন হইতে কন্‌খলে যাইলাম। শ্রীশ্রীমাতাঠাকরুণ কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। তারকদা ও হরিমহারাজ কন্‌খলে গেলেন।

তারকদা ইতিপূর্ব্বে বহুবার কন্‌খল ও হরিদ্বারে গিয়াছিলেন। এইবার, অনেক সময় বিকাল বেলা আমাকে লইয়া বড় খালের ধারের রাস্তাটীতে পায়চারী করিতেন। এই রাস্তাটী তাঁর বড় প্রিয় ছিল। কখনও কখনও বা কোন পার্ব্বণ উপলক্ষে দুই জন একত্রে ব্রহ্মকুণ্ডুতেও গিয়াছি। এইরূপ কিছুদিন অবস্থান করিয়া আমি বদ্রিনারায়ণ চলিয়া গেলাম। তারকদা আলমোরায় চলিয়া গেলেন।

তারকদা আরও কয়েকবার আলমোরায় গিয়াছিলেন। এই আলমোরায় অবশেষে তিনি একটী আশ্রম করেন। আমি যখন বৃন্দাবনে ছিলাম, তখন তিনি আলমোরা হইতে মাঝে মাঝে আমায় পত্রাদি লিখিতেন। তাঁহার হাতের লেখা অতি সুন্দর ছিল।

আমাকে উৎসাহিত করা—

১৯১৩ বা ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে সন্ধ্যার সময়টা আমি মঠের উঠানে একটা ক্যাম্বিসের চেয়ার পাতিয়া বসিয়া আছি এমন সময় তারকদা আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আমি সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিলাম। তিনি ক্যাম্বিসের চেয়ার খানিতে বসিলেন। আমার ক্যাম্বিসের চেয়ার খানিতে অপর কেহ বসিতেন না; ইহাই ছিল পরস্পরের প্রথা। যাহা হউক, সেইদিন তারকদা চেয়ার খানিতে বসিলেন। আমি তাঁর বাঁ দিকে মেঝেতে উঁচু হ'য়ে বসিলাম। আমি তখন স্থাপত্য শিল্প (Architecture) বইখানি লিখিতে সুরু করিয়াছি। তারকদা বলিলেন, "ওহে! ইংরাজীতে কেন লিখ্‌ছ? বাঙ্গালায় লেখ। নিজের ভাষায় লেখা নিতান্ত আবশ্যক। বিদেশী ভাষায় লেখ্‌বার আবশ্যক নেই।" আমি বল্‌লুম, "তারকদা, এ সকল জিনিষ বাংলায় লেখ্‌বার মতন ভাষাজ্ঞান আমার নেই। সেই জন্য, আমি অগত্যা ইংরাজীতে লিখ্‌ছি।" তারকদা বলিলেন, "না হে না, চেষ্টা কর, বাংলায় ঠিক্ বেরুবে। নিজের ভাষায় লেখাই আবশ্যক।" তারপর আমি একটু কাতর হ'য়ে বল্‌লুম, "তারকদা, আমি কি লিখ্‌ছি আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি নি। আমি ঝোঁকের মাথায় কি লিখে যাচ্চি। তুমি একবার দেখে শুনে দাও না? আমি তা' হ'লে অনেকটা সুস্থ হ'তে পারি।" তারকদা তখন উত্তেজিত হইয়া ডান হাতের তর্জ্জনীটী উত্তোলন করিয়া

হাত নাড়িতে নাড়িতে বলিতে লাগিলেন, "কিছু ভয় কোরো না! তুমি লিখে যাও! তুমি লিখে যাও। ও সব বিষয় কিছু ভাবতে হবে না! ঠাকুর সব কোরে নেবেন। ও অপরকে দেখাবার কোন আবশ্যক নেই! তুমি ক্রমাগত লিখে যাও! তা হ'লেই সব ঠিক হ'বে! যা' আবশ্যক হবে ঠাকুর সব ব'লে দেবেন! তুমি নিজে কিছু ভেবো না! সব তিনি করবেন!" তারকদা উত্তেজিত হইয়া কথাগুলি এমন ভাবে বলিয়াছিলেন যে আমার মনে যে একটা সন্দেহ ও বিষণ্ণ ভাব এসেছিল তা' সেই মূহূর্ত্তেই তিরোহিত হইল। বুকেও একটা সাহস ও নির্ভরের ভাব আসিল। তারকদার আদেশ অনুযায়ী আমি ইংরাজী ও বাঙ্গলা উভয় ভাষায় ধীরে ধীরে যৎসামান্য কিছু লিখিতে পারিয়াছি। আমার সেই বিষণ্ণ ও দ্বিধা ভাবের সময় তারকদা যে আমাকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন ও বুকে সাহস সঞ্চার করিয়াছিলেন, সেই জন্য আমি তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। আমি তারকদার চরণে শতকোটী প্রণাম করি এবং তাঁহার আশীর্ব্বাদ আমি নিজ মস্তকে ধারণ করি। আমার এই কৃতজ্ঞতা আমি সকলকেই জানাইতেছি। প্রণাম! প্রণাম! প্রণাম!

ভাব-সংবেশক মহাপুরুষ শিবানন্দ—

স্বামী ব্রহ্মানন্দের দেহান্তের পর তারকদা মঠের মোহন্ত

হন। এখন হইতে আমরা তাঁহাকে প্রকাশ্যভাবে ভাব-সংবেশক রূপে দেখিতে পাই।

ধর্ম্মজগতে তিন শ্রেণীর ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়—ভাব-উদ্বোধক (Thought Originator), ভাব-বিকীরক (Thought Propagator) এবং ভাব-সংবেশক (Thought Impressor)।

প্রথম শ্রেণী হইতেছেন ভাব-উদ্বোধক। ভাব-উদ্বোধক বহুল পরিমাণে নূতন ভাব বিশৃঙ্খলরূপে (Huge mass of new un-organised Ideas) রাখিয়া যান। তাঁহার জীবদ্দশায় কেহই তাঁহাকে সম্মান বা শ্রদ্ধা করে না; বরং অনেক সময় লোকে তাঁহাকে হীন ও পাগল বলিয়া উপহাস ও বিদ্রূপ করে। এই পুঞ্জীকৃত নব অসংস্কৃত ভাবরাশি কয়েকটী মাত্র ব্যক্তি উপলব্ধি করিয়া থাকেন—তাঁহারা হইতেছেন ভাব-বিকীরক —ধীশক্তি-সম্পন্ন ও মহা তেজস্বী। তাঁহারা এই ভাবগুলি পাইয়া প্রথমে অতীব বিলোড়িত হইয়া উঠেন। কয়েক বৎসর ধরিয়া এই ভাব সকল গভীর রূপে চিন্তা করিবার পর তাঁহারা ইহার গূঢ় অর্থ উপলব্ধি করেন এবং এই ভাবরাশি শ্রেণীবিভাগ ও স্তর অনুযায়ী সন্নিবেশিত করিয়া, নিজেদের ধীশক্তি ও সাহসবলে জগতের সম্মুখে নির্ভীকভাবে বিকীরণ করেন। তখন সাধারণ লোক ভাব-উদ্বোধককে কিছু বুঝিতে সমর্থ হয় এবং সম্মান ও শ্রদ্ধা করে; কারণ ভাব-উদ্বোধক পুঞ্জীকৃত নব ভাবরাশি আনিয়াছিলেন, কিন্তু ধীশক্তিসম্পন্ন ও মহা তেজস্বী ব্যক্তির

অভাবে তাহার বিকীরণ হইবার সুযোগ হয় নাই—অসংস্কৃত অবস্থাতেই বদ্ধ ছিল। ভাব-বিকীরকগণের দ্বারাই এই সকল ভাব জগতে প্রকাশ পাইল। ভাব-বিকীরকগণের ভাষা ও ভাবের অগ্নিময়ী তেজশিখা সহ্য করিবার ক্ষমতা সাধারণ লোকের নাই। ভাব-বিকীরকগণ ভয়ঙ্কর প্রভঞ্জন সম এক ব্যক্তিত্ব (Cyclonic Personality) লইয়া আসেন। ব্যক্তিগত জীবনে, ধর্ম্মজীবনে—সমগ্র মানবজীবনে যাহা কিছু দুর্ব্বল, যাহা কিছু মনুষ্যত্ববিকাশের পথে অন্তরায় তাহাই প্রচণ্ড রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া নির্ম্মম ও নির্দ্দয় হৃদয়ে ধ্বংশ করিয়া যান! ইহা দেখিয়া সাধারণ লোক ভীত ও ত্রস্ত হইয়া পড়ে। এই জন্য ভাব-বিকীরকগণের প্রতি সাধারণ লোকের শ্রদ্ধার ভাব অপেক্ষা ভীতির ভাবই বেশী হইয়া থাকে; আর এই জন্যই শেষোক্ত শ্রেণীর ব্যক্তির—ভাব-সংবেশকেরও আবশ্যক আছে। ইহারা ভাব-উদ্বোধক-অনুপ্রাণিত ভাব-বিকীরকগণের অগ্নিময়ী বাণীর তাৎপর্য্য শান্তভাবে ও মিষ্টভাষায় জনসাধারণের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিয়া থাকেন। এই কারণে ইহাঁরা জনপ্রিয় ও সাধারণের শ্রদ্ধাভাজন হইয়া থাকেন।

বিশেষভাবে আলোচনা করিলে ইহা বেশ স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, ভাব-উদ্বোধক বা উৎস-শীর্ষ (Fountain-head) হইতে যে শক্তি উদ্ভুত হইয়া থাকে, তাহা ধীরে ধীরে তিনটী বিশেষ ধারায়, তীব্র বা মন্থরগতিতে পৃথিবীময়

প্রবাহিত হয়। প্রত্যেক মহাধর্ম্ম বা মহাসঙ্ঘের গঠন ও প্রচারে ভাব-উদ্বোধক, ভাব-বিকীরক এবং ভাব-সংবেশক—তিনেরই অঙ্গাঙ্গিভাবে প্রয়োজন আছে। তিনটীর মধ্যে একটীকেও পরিত্যাগ করিলে মহাধর্ম্মের বা মহাসঙ্ঘের কোন কার্য্য চলিতেই পারে না; একের অবর্ত্তমানে অপরের স্বার্থকতাও থাকে না—ধর্ম্মজগতের ইতিহাস আলোচনা করিলে ইহাই দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ হইতে যে শক্তি উদ্ভূত হইয়াছিল, সেই শক্তি স্বামী বিবেকানন্দের ভিতর দিয়া জগতে বিকীর্ণ হইয়াছিল এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী শিবানন্দ-প্রমুখ মহাপুরুষগণের ভিতর দিয়া তাহা জনসাধারণের মধ্যে সংবেশিত হইয়াছিল।

এলাহাবাদে মুঠিগঞ্জ মঠে—

১৯২২।২৩ খৃষ্টাব্দের শীতকালেতে তারকদা প্রয়াগ যান। আমি তখন কিছু দিন এলাহাবাদের মুঠিগঞ্জের মঠে ছিলাম। পরে 'ব্রহ্মবাদিন্ ক্লাবে' আসিয়া অবস্থান করি। এই সময় 'ব্রহ্ম-বাদিন্' ক্লাব হিউয়েট রোডের উপর গাড়িবারান্দাওয়ালা বাড়ীটীতে ছিল। তারকদা স্বামী সদাশিবানন্দকে (ভক্তরাজ বা হরিদাস ওদেদার—যিনি স্বামীজির তিরোধানের কিছু পূর্ব্বে ৺কাশীধামে স্বামীজির নিকট দীক্ষা লইয়াছিলেন) আদেশ করেন যে, স্বামীজি দেহত্যাগের পূর্ব্বে কাশীতে যে কিছু দিন

অবস্থান করিয়াছিলেন, সে সময়ের কথা যাঁহার যাহা স্মরণ আছে তিনি যেন তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন। আমি তদনুযায়ী 'ব্রহ্মবাদিন্ ক্লাবে' বসিয়া ভক্তরাজ কথিত স্বামীজির উপাখ্যান লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম। ইহার নাম "৺কাশীধামে স্বামী বিবেকানন্দ"।

এই সময় অনেকেই মহাপুরুষ শিবানন্দের কাছে দীক্ষা লইবার জন্য উৎসুক হইলেন। একদিন তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমে অন্ততঃ তেইশ জনকে দীক্ষা দিয়াছিলেন। সেই দিন, সকালবেলা মুঠিগঞ্জের মঠের ঠাকুর ঘরেতে সকাল আট্টার সময় দীক্ষা দিতে বসিয়াছিলেন এবং দীক্ষা দিয়া উঠিতে প্রায় তিনটা বাজিয়া গিয়াছিল; তাহার পর তিনি সামান্য আহারাদি করিয়াছিলেন। সেই দিন একটী যুবক ভাত খাইয়া পান চিবাইতে চিবাইতে দশটার সময় আফিস যাইবার পথে 'ব্রহ্ম-বাদিন্ ক্লাবে' সহসা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসে। আমি তাহাকে বলিলাম, "মহাপুরুষ শিবানন্দের কাছে সকলে দীক্ষা নিচ্চে, তুমিও যেন আজ দীক্ষা নিয়ো।" সেই যুবকটী একটু সঙ্কোচ করিয়া বলিল, "আমি আহার ক'রেছি—আফিস যাচ্ছি; এরূপ অবস্থায় দীক্ষা নেওয়া কি ক'রে সম্ভব হবে?" আমি বলিলাম, "মহাপুরুষের কাছে যাও, তিনি যা বিবেচনা করেন্ তাই হবে।" অগত্যা সে মুঠিগঞ্জের মঠে যাইল। মহা-পুরুষ শিবানন্দ কোন দ্বিধা বা আপত্তি না করিয়া তাহাকে

প্রথমেই দক্ষা দিলেন এবং সে এক ঘণ্টার পর নিজের আফিসে চলিয়া গেল।

এই স্থলে, এইটী বিশেষ দ্রষ্টব্য যে, মহাপুরুষ শিবানন্দ এত উন্নত অবস্থার লোক ছিলেন যে, তাঁহার কাছে বিধি, নিষেধ, শুচি ও অশুচি বলিয়া কোন প্রতিবন্ধকই থাকিত না। তিনি মুক্তপুরুষ ছিলেন। এই জন্য, তিনি নিয়মের অতীতে গিয়াছিলেন; তাঁহার কথা স্বতন্ত্র। অত উচ্চ অবস্থায় যাইলে বিধি-নিষেধ বলিয়া কোন রীতিই থাকে না। অবশ্য অপরের পক্ষে এ প্রথা নহে। কেহ যেন এ ভাব অনুকরণ না করেন। মহাপুরুষ শিবানন্দ শক্তিমান্ পুরুষ ছিলেন, এই জন্য তাঁহার পক্ষে এ সব সম্ভব ছিল।

গুরু হইয়াও গুরুগিরি করেন নাই—

ভগবান্ বুদ্ধ সাধন মার্গে কি কি অন্তরায় তাহা অতি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছিলেন।

"ক্ষুৎপিপাসে প্রথমশ্চৈব কামাশ্চ দ্বিতীয়স্তথা।
সংশয়স্তৃতীয়শ্চৈব অহঙ্কারশ্চতুর্থকঃ ॥"

সাধনার প্রথম অবস্থায় ক্ষুধাতৃষ্ণাদি দেহভাব মনকে স্থির হইতে দেয় না। ক্ষুৎপিপাসাদি জয় করিবার পর দ্বিতীয় অবস্থায় নামরূপাদি দ্বারা আকৃষ্ট চিত্ত বহুবিধ কামনার দিকে ছুটীতে থাকে। তৃতীয় অবস্থা আরও ভীষণ—সংশয়, অর্থাৎ "আমার

কাজ করে কিছু ফল কি না, যা কাজ করেছি সে সমস্তই হয়ত ভুল হ'য়েছে, আর যে লক্ষ্যের দিকে যাচ্ছি সেটাও বুঝি ভ্রমাত্মক!"—এইরূপ সংশয় সাধকের চিত্ত অতীব আলোড়িত করে। ইহার পর আর এক অন্তরায় আছে, তাহার নাম অহঙ্কার, অর্থাৎ "আমিই সব করেছি ও করিতেছি এবং আমাকেই সব করিতে হইবে। অপরে কেউ আমার সমান নয়। আমিই সকলের চেয়ে বড়" ইত্যাদি। তখন বিরাট শক্তির প্রতি দৃষ্টি নাই—"মহাশক্তি ভাঙ্গে গড়ে, নিয়তই শক্তি বহে হ্রাসবৃদ্ধি হীন"—এই বোধ তখনও হয় নাই। সাধকের সাধনার পথে এই চারিটী মহা অন্তরায়। শেষোক্ত এই "অহঙ্কার"কেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ "লোকমান্য" বলিতেন।

আমেরিকায় যখন প্রথম কৃতিত্ব ও যশের কথা বাহির হইল স্বামীজি তখন সকলকে অতি বিনীত ভাবে পত্রাদি লিখিতেন। শ্রদ্ধেয় গিরিশবাবু এই সকল শুনিয়া সুন্দর একটী কথা ব'লেছিলেন, "মান হজম করা—এ বড় যে সে ব্যাপার নয়, এতে বড় 'লিভারের' আবশ্যক। তা' না হ'লে এ জিনিষ হজম করা যায় না!"

মহাপুরুষ শিবানন্দ স্বামী যদিও সাধন মার্গের খুব উচ্চ অবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন, ইহারই ফলে যদিও বহু সংখ্যক লোক তাঁহার কাছে দীক্ষা লইতে আসিতেন, কিন্তু তিনি নিতান্ত বালক, নিরভিমান, নিরহঙ্কার ও সকলেরই কাছে সংযত,

তাঁহাতে লেশমাত্র কর্কশভাব ছিল না—তিনি এমন মিষ্টভাষী ছিলেন যে, সে সময়ে যাঁহারা তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিতেন, তাঁহারা সকলেই এক বাক্যে বলিতেন—"হাঁ, যথার্থই মহাপুরুষ বটে!" যাঁহার পায়ে শত শত লোক মাথা নত করিতেছে, শত শত লোক যাঁহাকে গুরু বলিয়া বরণ করিতেছে, যাঁহাকে একটী-বার মাত্র দর্শন করিবার জন্য এত লোকের সমাগম, তিনি কিনা ছোট বড় সকলেরই কাছে সংযত ও বিনয়ী—কোন প্রকার উদ্ধত ও প্রাধান্যভাবের লেশমাত্রও তাঁহার ভিতর নাই! গিরিশ বাবুর সরল অথচ উচ্চভাবপূর্ণ কথায় বল্‌তে হ'লে—মহাপুরুষ শিবানন্দ যে সম্পূর্ণরূপে "মান হজম" ক'রেছিলেন, এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। তিনি গুরু হইয়াও গুরুগিরি করেন নাই।

স্নিগ্ধজ্যোতি বিতরিছে ধরাধামোপরি—

১৯২২।২৩ খৃষ্টাব্দে, আনুমানিক পৌষ মাসে, মুঠিগঞ্জের মঠে সন্ধ্যার সময় অনেক লোক মহাপুরুষ শিবানন্দকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। মহাপুরুষ শিবানন্দ ও হরিপ্রসন্ন মহারাজ (স্বামী বিজ্ঞানানন্দ), এই দুইজনে দুইখানি চেয়ারে বসিলেন। আমিও একটা কি লইয়া বসিলাম; আর অধিকাংশ লোকই উঠানে ও দালানে দাঁড়াইয়া রহিলেন; কারণ ছোট উঠান, সকলের বসিবার স্থান সঙ্কুলান হইল না। গোবিন্দ ডাক্তারও একটু পরে আসিয়া একটা কি লইয়া বসিলেন। দর্শকবৃন্দের

মধ্যে কেহ কেহ মহাপুরুষ শিবানন্দকে দুই চারিটী প্রশ্ন করিলেন। তিনি এত অল্প শব্দের ভিতর, এমন সুন্দর ভাবে নিজের বক্তব্য বুঝাইয়া দিলেন যে আমি তাহা শুনিয়া বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। সেই সময় তাঁর কণ্ঠের স্বর, চক্ষের দৃষ্টি ও মুখের ভাব এমন স্নেহপূর্ণ, এমন নম্র, এমন বিনয়ী ভাব ধারণ করিয়াছিল যে, দেখিয়া বোধ হইল যেন তিনি একটী পাঁচ ছয় বৎসরের বালক মাত্র। সকলের কাছেই নম্র, সকলের কাছেই বিনয়ী, সকলের কাছেই ঋজু। কথাগুলিতে যেন মিষ্টি মাখানো।

মহাপুরুষ শিবানন্দের এইরূপ ঋজু ভাব দেখিয়া প্রথমটা আমি একটু ব্যথিত হইয়াছিলাম। মনে হইল, 'তিনি এইরূপ হইয়া যাইলে মিশনের সমস্ত কাজ-কর্ম্ম কি করিয়া করিবেন!' কারণ, সাধারণের ধারণা এই যে, যে ব্যক্তি তেজী ও দাপট্ করিতে পারে, সেই বড় কর্ম্মী হয়। এই জন্য, আমার প্রথম এই ভ্রমটা আসিয়াছিল এবং এই জন্যই আমি মহাপুরুষ শিবানন্দের এই অতীব ঋজু ভাব দেখিয়া অতিশয় ব্যথিত ও চিন্তিত হইয়াছিলাম।

দু'তিন দিন তাঁহাকে বিশেষ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করার পর বুঝিতে পারিলাম যে, মহাপুরুষ শিবানন্দ একটা নূতন পথ বাহির্ করিলেন—নম্র ভাব, ঋজু ভাব, ভালবাসা দিয়াও প্রভূত কার্য্য করা যাইতে পারে। পূর্ব্ব ভাব একেবারে পরিবর্ত্তন হইয়া

যাইল এবং জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ শিবানন্দ যেন এক নূতন ভাবের মানুষ হইলেন!

পরবর্ত্তী কয়েক বৎসর তিনি যে অসীম ভালবাসা ও শক্তি বিকাশ করিয়াছিলেন, মুঠিগঞ্জের মঠে তাহা প্রথম লক্ষ্য করি। ইহাকেই বলে অহৈতুকী ভালবাসা—ভালবাসার জন্যই ভালবাসা—প্রতিদানের কোনই প্রত্যাশা নাই! মোট কথা, এই সময় হইতেই তাঁহার হৃদয় হইতে একটা ভালবাসা বা আত্মপ্রসারণের (Self-expansion) উৎস উঠিয়াছিল, আর তিনি তাহা অযাচিত ভাবে প্রবাহিত করিয়াছিলেন।

মুঠিগঞ্জের মঠে দেখিলাম—কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, কি ধনী, কি দরিদ্র, কি মানী, কি সামান্য লোক, মহাপুরুষ শিবানন্দের কাছে সকলেই সমান ভালবাসা পাইতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলে এমন একটা লোকের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন যে, সেখানে এই সব পার্থক্য একেবারেই নাই, সকলেই তাঁহার অশীর্ব্বাদ ও ভালবাসার পাত্র,কোনও প্রকার সামাজিক ব্যবধান-বোধ বা অন্য কোন প্রকার পার্থক্যের ভাবও সেই সময়টা কাহারও মনে ছিল না, কোনও প্রকার হিংসা, দ্বেষ, উঁচু নীচু ভাব কাহারও ভিতর রহিল না; কিন্তু, সকলেই যেন এমন এক মহাপুরুষের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন যে যাঁহার পরিধি ও উন্নতত্বের কিছুই পরিমাণ করা যায় না! অথচ তিনি একটী ৫।৬ বৎসরের বালকের মতন! "অণো রণীয়ান

মহতো মহীয়ান্”—অণুর চেয়েও তিনি ছোট, মহতের চেয়েও তিনি বড়। আমি দিনের পর দিন তাঁহাকে দেখিতাম এবং মনে মনে চিন্তা করিতাম, ‘এখন হইতে তিনি তাঁহার পূর্ব্ব-সঞ্চিত শক্তি বিকাশ করিবেন এবং ঋজুতা ও মিষ্ট ভাষা দিয়া তাহা জগতকে বিতরণ করিয়া যাইবেন।’ এই সময়টাকেই তাঁহার সাধনলব্ধ শক্তির বহির্বিকাশের কাল বলা যাইতে পারে।

দেখিলাম, মহাপুরুষ শিবানন্দের দেহের ভিতর হইতে এক প্রলয়ঙ্করী অগ্নিশিখা উঠিতেছে—তাহার কাছে উপস্থিত জ্যোতি সকল হীনপ্রভ হইয়া যাইতেছে; কিন্তু সেই অগ্নিশিখা, সেই জ্যোতি চক্ষুর পীড়া দায়ক নহে, সেই জ্যোতি অঙ্গুলি ও চর্ম্ম দগ্ধ করে না। সেই অগ্নিশিখা, সেই দীপ্তিপুঞ্জ স্নিগ্ধ, স্থির ও মাধুর্য্যপূর্ণ। ভালবাসা—আত্মপ্রসারণ জ্যোতীরূপ ধারণ করিয়া তাঁহার ভিতর হইতে স্নিগ্ধ কিরণ বিকীরণ করিতে লাগিল!

“স্নিগ্ধ জ্যোতি বিতরিছে ধরাধাম’ পরি।
শীতল যে হ’ল তনু কিরণ পরশে ॥”

রেখা বিবর্জ্জিত সাধক স্বামী শিবানন্দ—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ “বাহ্যিক পূজা ও আভ্যন্তরিক পূজা” বলিয়া একটী কথা বলিতেন। ধর্ম্মশাস্ত্রে পূজা তিন অংশে বিভাগ

করা হইয়াছে—দার্শনিক (Metaphysical) ভাব, ভক্তির (Devotional) ভাব এবং বিধিপূর্ব্বক (Ritualistic) বা সামাজিক (Social) অনুষ্ঠান।

দার্শনিক অংশে ধর্ম্মের সূক্ষ্মাংশ নিরূপিত হয় এবং তদনুযায়ী এক সম্প্রদায় বা মত হইতে অপর সম্প্রদায় বা মতের কি পার্থক্য বা বৈশিষ্ট্য তাহা যুক্তি দ্বারা চিন্তাধারা প্রচারিত হয়। যেমন কোন সম্প্রদায় অদ্বৈতবাদী, কোন সম্প্রদায় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, কোন সম্প্রদায় বা দ্বৈতবাদী—এক ব্রহ্মসূত্র অবলম্বন করিয়াই আপন আপন মতানুযায়ী জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ ও সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করিতেছেন; নানা তর্ক যুক্তি দ্বারা অপর মত খণ্ডন ও আপন মত প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াস করিতেছেন। ভক্তিপ্রদর্শন বা ধর্ম্মানুষ্ঠানাদি দার্শনিক মতের ইঙ্গিতে পরিচালিত হইয়া থাকে। মত পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্ঠানাদিরও পরিবর্ত্তন ঘটে। ইহার ফলে আবার সম্প্রদায় মধ্যে নানা শাখার উদ্ভব হইয়া পড়ে। হিন্দুদিগের ন্যায়, বৌদ্ধ ও ক্রীশ্চান প্রভৃতি অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের ভিতরেও এইরূপ দার্শনিক মতানুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন শাখার সৃষ্টি হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। দার্শনিক মত হইল সম্প্রদায়ের ভিত্তি। ইহার প্রভাব ক্ষীণ হইলে সম্প্রদায় দুর্ব্বল হইয়া যায়। দার্শনিক ভাবটী অতি অল্পসংখ্যক লোকের ভিতরই প্রবেশ করান যায়; কারণ খুব অল্পলোকই চিন্তাশীল। ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক নিষ্ঠার সহিত বিচার করিয়া

কোনও ধর্ম্মমত ধারণা করিতে কয়জন সক্ষম হয়? অধিকাংশ ব্যক্তিই আদেশ অনুসরণ বা অপরকে অনুকরণ করিয়া চলে। দার্শনিক ভাব অতি সূক্ষ্ম অর্থাৎ সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়েরও অগোচর এবং শুষ্ক ও কঠোর। এই জন্য অতি অল্পসংখ্যক লোকেই দার্শনিক মতের অধিকারী হইতে পারে। ভক্তির অংশ—দার্শনিক ভাবটী কি প্রকারে অনুভব করা যাইতে পারে তাহারই সাধন সংজ্ঞা। ভক্তির ভিতরেও শাখা বা 'থাক' পরিলক্ষিত হয়—উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন ইত্যাদি। ভক্তি ভাবেতে সর্ব্বদাই একটী ইষ্ট বা উপাস্য থাকেন—পূজ্য ও পূজক বা সেব্য ও সেবক ইত্যাদি ভাবের সম্বন্ধে। এই ইষ্ট লাভের জন্য ভক্তি-সাধকেরা কতকগুলি বিশেষ পূজা-পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া থাকেন। উচ্চ অধিকারী হউক বা নিম্ন অধিকারী হউক সকলেই ভক্তি লাভ করিতে পারেন। পূজা-পদ্ধতি বা সামাজিক ক্রিয়াদি, যাহাকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ "বাহ্যিক পূজা" বলিতেন—উহা দার্শনিক ও ভক্তিভাব হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। যে যেমন দেশে, প্রাকৃতিক বৈচিত্রে এবং জল বায়ুতে বাস করিবে, যাহার জীবনে যে প্রকার সামাজিক আবর্ত্তন ও অবস্থার তারতম্য ঘটিবে তাহার পক্ষে সেইরূপ প্রক্রিয়াদি প্রযুজ্য হইবে। এই জন্য দেশ, কাল ও পাত্র অনুযায়ী ধর্ম্মের এই অংশটী সকল সময়ই পরিবর্ত্তিত হয়। ইহা ধর্ম্মের এক প্রয়োজনীয় অবান্তর অংশ-বিশেষ; শাশ্বত বা চিরন্তন অংশ ইহা নহে। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

সম্প্রদায়গুলি এই অংশটী ব্যবহারিক বিধি-নিষেধের লৌহ গণ্ডীর দৃঢ় আবর্ত্তনে রক্ষা করিতে চেষ্টা করে। এই কারণে, সম্প্রদায়ের মধ্যে কখনও চিত্তের প্রসারণ হয় না। ভাবশূন্য কর্ম্মদ্বারা উহার সংকীর্ণতা সম্পাদন করে মাত্র।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমৎবিবেকানন্দের জীবনে যে ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মপথ প্রদর্শিত হইয়াছে তাহার মহান্ ভাব সমগ্র জগৎ ব্যাপী প্রসারিত হইবার পূর্ব্বাভাষ পাওয়া যাইতেছে। মহাধর্ম্ম কোনও ব্যক্তিবিশেষের, কোন সপ্রদায় বিশেষের বা কোন জাতি বিশেষের নিজস্ব সম্পত্তি নহে যে, তাহাকে কোনরূপ সঙ্কীর্ণ আবেষ্টনের ভিতর রাখা যাইতে পারে—বিশ্বব্যাপী বিকাশই তাহার স্বভাব। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথিত "আভ্যন্তরিক" পূজার দৃঢ় পক্ষপাতী স্বামী বিবেকানন্দ এইজন্যই সর্ব্বদা বলিতেন, "ঘণ্টা নাড়া থামা!" এই ভাবের প্রেরণাতেই, ধর্ম্মের বিশালতা অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য—তিনি মায়াবতীর মঠ প্রতিষ্ঠানকালে এক কঠোর আদেশ দিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। যাঁহারা এই কঠোর আজ্ঞার বিষয় জানেন তাঁহারা এ বিষয় বুঝিতে পারিবেন।

যাহা হউক, এ কথাও স্বীকার করিতে হইবে যে পূজা-প্রক্রিয়াদি কিছু পরিমাণে না রাখিলে গণ-সমাজের ভিতর উক্ত দুইটী ধর্ম্মভাব প্রবেশ করে না—ইহারও আবশ্যক আছে। কিন্তু ইহা কি পরিমাণে রাখিতে হইবে তাহা নিরূপণ অতি কঠিন সমস্যার বিষয়। ইহা হইতেছে আবশ্যকীয় অনাবশ্যক-অংশ

(Necessary unavoidable evil to Society.) যাঁহারা মনে করেন যে পূজা-প্রক্রিয়াদিই হইল ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ—তাঁহারা ভ্রান্ত। আর যাঁহারা পূজা-প্রক্রিয়াদি একেবারে উঠাইয়া দিতে চাহেন তাঁহারাও ভ্রান্ত। ব্যক্তিগত জীবনে তাঁহারা ইহা করিতে পারেন বটে, কিন্তু সমগ্র সমাজ বা সম্প্রদায়ে তাহা কখনই প্রযুজ্য হইতে পারে না। "বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক" পূজা—দুইই রাখিতে হইবে; তবে দার্শনিক মতটাই প্রবল রাখিতে হইবে। কোনও ধর্ম্মসম্প্রদায়কে সজীব ও কর্ম্মঠ রাখিতে হইলে শুষ্ক, নীরস দার্শনিক মতের গভীর আলোচনা, কঠোর সাধন-ভজন এবং উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব সমূহ সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচার এবং দৈনিক জীবনে উহা ব্যবহারযোগ্য করিতে ধর্ম্ম-যাজকগণের বিশেষ তৎপরতা এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হয়; তাহা না করিলে বিধি-নিষেধ ও গোঁড়ামীর নিষ্পেষণে সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যের ও অস্তিত্বের লোপ সুনিশ্চিত।

এ স্থলে বিশেষ করিয়া জানা আবশ্যক যে, এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা এই বিধি-নিষেধকেই ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ বলিয়া থাকেন। যাঁহারা বিধি-নিষেধ, শুচি-অশুচি, মেধ্য ও অমেধ্য এই সমস্ত লইয়া অনবরত বিচার করিতেছেন এবং ইহার ঊর্দ্ধে বা অধে কি আছে তাহা দেখিতে চেষ্টা না করেন, তাঁহা-দের নিজস্ব চিন্তা করিবার বিষয় কিছুই নাই, তাঁহারা ভয়ত্রস্ত হইয়া সমস্ত জীবন অতিবাহিত করেন এবং অদৃশ্য, অলক্ষিত

দানব-দৈত্য আসিয়া তাঁহাদের নরকগামী করিবে, অর্থাগমের ক্ষতি করিবে বা সংসারের কোন অকল্যাণ করিবে—এই চিন্তা সর্ব্বদাই তাঁহাদের বিব্রত করিয়া থাকে। বুঝিতে হইবে, এই সকল দুর্ব্বলচিত্তের লোক ধর্ম্মজীবনের প্রথম অবস্থায় দুর্ব্বল-স্নায়ুবিশিষ্ট কোনও ব্যক্তির সংস্পর্শে আসায় তাঁহাদের সমস্ত জীবনটাই এইরূপ ভীতিবর্ণে রঞ্জিত হইয়া গিয়াছে। এই সকল ব্যক্তিকে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধিত করা বিশেষ প্রয়াসসাধ্য। মোট কথা, বিধি-নিষেধ সাধনমার্গের প্রথম সোপানে উপকার আনিয়া দিতে পারে সত্য, কিন্তু এইটাকেই যেন আমরা ধর্ম্ম-জীবনের অলঙ্ঘনীয় মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া মনে না করি। ইহাকে ক্রমে ক্রমে ত্যাগ করিতে হইবে। সর্ব্ববিষয়ে মুক্ত হওয়াই না জীবনের উদ্দেশ্য? স্বামীজি বলিতেন, ' Through Laws unto No Laws"—নিয়মের মধ্য দিয়াই নিয়মশূন্য স্থানে যাইতে হইবে। স্বামী শিবানন্দ এই ভাবটীর জ্বলন্ত উদাহরণ। বিধি-নিষেধের কোন রকম সঙ্কীর্ণ-গণ্ডীই তাঁহার উন্মুক্ত, উদার ও নির্ম্মল জীবন-প্রবাহকে আবদ্ধ করিতে পারে নাই। এইজন্যই সর্ব্বশ্রেণীর, সর্ব্বজাতির, সর্ব্বধর্ম্মের ও সকল অবস্থার লোক যাঁহারা তাঁহার কাছে আসিতেন, তাঁহাদের তিনি নিমেষমাত্রে অতি আপনার করিয়া লইতে পারিতেন এবং তাঁহারাও তাঁহাকে আপনার হইতেও আপনার জন বলিয়া অনুভব করিতেন। যাঁহারা স্বামী শিবানন্দকে ঘনিষ্ঠভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন

তাঁহারা স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন যে তিনি এই সকল ভাবের মূর্ত্তিমান বিগ্রহ ছিলেন। পাঠকগণও এই গ্রন্থে লিখিত বিভিন্ন উপাখ্যানগুলিতে তাহার কিছু আভাষ পাইয়া থাকিবেন। এমন মহান্ উদার ভাব অপরের ভিতর খুব কমই পরিলক্ষিত হয়। আমি বাল্যকাল হইতেই তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসায় তাঁহার এই সকল ভাব অল্পমাত্র উপলব্ধি করিবার সুযোগ পাইয়াছি। তিনি ছিলেন রেখাবিবর্জ্জিত সাধক! শিবানন্দ-চরিতের ইহাই বিশেষ মাধুর্য্য!

ত্রিবিধ বন্ধন মুক্ত পুরুষই মুক্ত পুরুষ—

কন্‌খলের মথুরাদাস নামক এক সিদ্ধ পুরুষকে একবার প্রশ্ন করা হইয়াছিল, "মুক্তপুরুষ কা'কে বলা হয়?" তিনি গম্ভীর হইয়া উত্তর করিলেন, "সমাজবন্ধন, বেদবন্ধন এবং গুরুবন্ধন—এই তিন বন্ধন যে ত্যাগ করিতে পারে, সেই মুক্ত-পুরুষ।" সমাজবন্ধন বলিতে, মোটামুটি বুঝিতে হইবে—সমাজ-ভীতি। সাধারণ লোক সর্ব্বদাই ত্রস্ত থাকে, শুনিবার জন্য কান পাতিয়া উৎসুক থাকে তাহার বিষয়ে কে কি ভাল মন্দ বলিল। এই সমাজ ভয়ে ভীত হইয়া অনিচ্ছায় "গোঁজামিল" দিতে দিতে তাহার জীবন দীপ নির্ব্বাপিত হইল! দ্বিতীয় হইতেছে—বেদবন্ধন। শাস্ত্রে কি বলিয়াছে—কি বিধি, কি নিষেধ, কি

মেধ্য এবং কি অমেধ্য,—এই লইয়া তর্ক ও আলোচনা করিতে করিতে নিজের প্রাণে আর কোন উচ্চ বস্তুর উপলব্ধি হইল না। এই ভাব লক্ষ্য করিয়াই ভগবান্ বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন—"What is the good of chanting the Vedas? Liberation is possible without bribes or brokers"—বেদ আবৃত্তি করিয়া লাভ কি? উৎকোচ ও মধ্যস্থ ব্যক্তি (দালাল) ব্যতিরেকেও মুক্তি লাভ করা সম্ভব। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, "অধিকাংশ লোক শাস্ত্রকে মাথায় ক'রে রেখে শাস্ত্রের চাপে মারা গেল! আর দু'একটা লোক শাস্ত্রকে পায়ের তলায় রেখে তা'র ওপর দাঁড়িয়ে নিজের চক্ষে জগতকে দেখ্‌তে লাগ্‌ল!" কাহাদের দ্বারা এবং কোন্ অবস্থা হইতে এই সকল কথা বলা সম্ভব হইতে পারে পাঠকগণ তাহা নিজেরা কল্পনা করিয়া বুঝিয়া লইবেন! তৃতীয় হইল—গুরুবন্ধন। নিজের গুরু কি বলিয়াছেন, নিজ সম্প্রদায় কি বলিয়াছে ইত্যাদি—এই লইয়া মানুষ ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকে। নিজের নিরপেক্ষ চিন্তা-শক্তি জাগাইতে বা ব্যক্তিত্ব বিকাশ করিতে কিংবা মনকে উচ্চস্তরে—গুণাতীত অবস্থায় তুলিতে বা তুলিবার চেষ্টা তাহার আর অবসর, অধিকার বা সামর্থ্য হয় না।

বিশেষ জ্বলন্তভাবে না হউক, অল্পবিস্তর ভাবে স্বামী শিবানন্দের ভিতর এই সকল ভাব দেখিতে পাওয়া যাইত। সেই জন্য, এই ত্রিবিধ বন্ধনের কথা উল্লেখ করিলাম। সিদ্ধপুরুষ মথুরাদাসের

কথাগুলি প্রত্যেক সাধকেরই বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য।

অস্তি, ভাতি, প্রিয়—

ব্রহ্মের লক্ষণ হইতেছে—অস্তি, ভাতি, প্রিয়। প্রীণাতি'র অর্থ হইতেছে—চিত্তের আকর্ষণ (Attraction) অর্থাৎ নিজের কাছে টানিয়া আনা। ইহার সাধারণ অর্থ আকর্ষণীশক্তি বা ভালবাসা। ভাতির অর্থ—বিকাশ (Emanation) বা দীপ্তিময় করা। অস্তি (Existence) উপলব্ধি করা যায় না; কিন্তু ইহা হইয়া যাওয়া যায়। "ভাতি" ও "প্রীণাতি"—এই দুইটী ভাব বিকাশ করা যাইতে পারে। পুণ্যদর্শন মহাপুরুষ শিবানন্দের ভিতর এই "প্রীণাতি" ভাবটী খুব প্রকাশ পাইয়াছিল অর্থাৎ তিনি চুম্বুকের ন্যায় সকলকে নিজ হৃদয়ের ভিতর টানিয়া লইতেন। ভাতি বা দীপ্তিময়—তাঁ'র কথাগুলি এত উচ্চ অবস্থার বিষয়ে হইত যে তাহাকে কারণাতীত ভাব বলা যাইতে পারা যায়। সাধারণ ভাব—গুণবদ্ধ ভাব। তাঁহার ছিল গুণাতীত ভাব।

এই সকল লক্ষণ দেখিয়া অনুধ্যান করিলে ইহা নিঃসন্দেহে ও নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, মহাপুরুষ শিবানন্দ ব্রহ্মবিৎ বা ব্রহ্মকল্প পুরুষ ছিলেন।

স্থানান্তরে—

প্রয়াগ হইতে মহাপুরুষ শিবানন্দ কন্‌খলে যান এবং তথা হইতে বোম্বাই, মান্দ্রাজ প্রভৃতি নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া অবশেষে বেলুড় মঠে আগমন করেন। পূর্ব্বে তিনি দার্জ্জিলিং, মধুপুর প্রভৃতি অনেক স্থানেও বাস করিয়াছিলেন।

সভ্যতার স্তম্ভ-চতুষ্টয়ের আধার স্বামী শিবানন্দ—

ভালবাসা, স্বাধীনতা, সত্যনিষ্ঠা এবং ন্যায় বিচার—Love, Liberty, Truth এবং Justice—এই গুণ-চতুষ্টয় মানবজাতির সভ্যতার ভিত্তি-স্তম্ভ স্বরূপ। মানবজাতির উন্নতি বা সভ্যতা বলিতে যাহা কিছু বুঝায় তাহাই ইহার উপর নির্ভর করিতেছে। এই একটী স্তম্ভের পতনে সমগ্র মানবজাতির সভ্যতার পতনও অবশ্যম্ভাবী। ইহার কোন একটীর পতনে সমষ্টি জীবনের শান্তি ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ হয়। একত্রে সঙ্ঘবদ্ধভাবে বাস করিতে হইলে সমষ্টির অন্তর্গত সকলেরই এই গুণগুলি পালনের দিকে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। বিশেষতঃ, যাঁহারা কোন সঙ্ঘ, সম্প্রদায় বা দশজনের অধিনায়করূপে অধিষ্ঠিত, তাঁহাদের এই সকল গুণের আধার হওয়া আরও অধিক আবশ্যক। অনুগামী সাধারণ ব্যক্তি অধিনায়কের নিকট তুল্য ভালবাসা, তুল্য স্বাধীনতা এবং সর্ব্বোপরি অধিনায়কের সত্যনিষ্ঠা ও ন্যায় বিচার প্রত্যাশা করে। অধিনায়ক যদি পাত্র বিশেষকে অধিক বা অল্প ভালবাসেন,

সকলকে যদি সমান অধিকার বা স্বাধীনতা না দেন, যদি নিজে সত্য হইতে চ্যুত হন, যদি সকলকে সমদৃষ্টিতে দেখিয়া ন্যায় বিচার না করেন—তাহা হইলে সঙ্ঘ, সম্প্রদায় বা জনসমষ্টির ভিতর প্রীতি, শান্তি ও শৃঙ্খলার পরিবর্ত্তে—ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, বিবাদ, বিরোধ ও বিশৃঙ্খল ইত্যাদি ভাব আসিয়া একতাসূত্রে গ্রথিত সমষ্টির জীবনে অধঃপতন আনিয়া দিবে। এই জন্য সঙ্ঘ বা সম্প্রদায়ের যাঁহারা পরিচালক বা জনসমষ্টির যাঁহারা নায়ক, তাঁহাদের এই ভালবাসা, স্বাধীনতা, সত্যনিষ্ঠা ও ন্যায় বিচারের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া কার্য্য পরিচালনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

মঠ ও মিশনের উচ্চতমপদে আসীন স্বামী শিবানন্দ এই গুণ চতুষ্টয়ের প্রত্যক্ষ ও জ্বলন্ত মূর্ত্তি ছিলেন। প্রথমেই চক্ষের সম্মুখে আসে তাঁহার অহৈতুকী ভালবাসার মূর্ত্তি। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ভিতর যে ভালবাসা দেখিয়াছিলাম, বিশ্বপ্রাণ স্বামী-বিবেকানন্দের ভিতর যে ভালবাসা দেখিয়াছিলাম, অজাতশত্রু স্বামী ব্রহ্মানন্দের ভিতর যে ভালবাসা দেখিয়াছিলাম—জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দের ভিতরও সেই মূর্ত্তিমতী ভালবাসা দেখিলাম! ঠিকই এই কথাটী—"প্রেমময় মূরতি জনচিত্তহারী!"

স্বাধীনতাপ্রিয়, উন্মুক্ত, উদার স্বামী শিবানন্দ অপরের স্বাধীনতায় কখনও হস্তক্ষেপ করিতেন না—তাঁহার স্বভাবই ছিল Non interfering. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "কারুর ভাব নষ্ট করিস্‌নি।" স্বামী শিবানন্দের জীবনের সকল কাজেই এই

ভাবটী বিশেষরূপে পরিস্ফুট ছিল। তিনি কাহারও ভাব নষ্ট করিতেন না। তিনি নিজে যেমন স্বাধীনতাপ্রয়াসী ছিলেন, অপরকেও তেমনি পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিবার সুযোগ ও সুবিধা দিতেন।

মঠ ও মিশনের উচ্চতম পদে আসীনকালে এমন অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে যাহাতে স্বামী শিবানন্দের একটী "হাঁ" বা "না"তে মঠ ও মিশনের অনেক কিছু পরিবর্ত্তন হইয়া যাইত; কিন্তু সত্যনিষ্ঠ স্বামী শিবানন্দ কখনও মিথ্যাকে আশ্রয় করিয়া সত্যের মর্য্যাদার অবমাননা করেন নাই। শিখগুরু অর্জ্জুন সিং যখন শত্রুকে আপন শিরশ্ছেদন করিতে দিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন,—"শির দেঙ্গা সের না দেঙ্গা!"—মাথা দিব কিন্তু ধর্ম্মবিশ্বাস দিব না! ধন্য এই ধর্ম্মবীরগণ—যাঁহাদের পবিত্র জ্বলন্ত উদাহরণে ধর্ম্মজগতের ইতিহাস আজও উজ্জ্বল! স্বামী শিবানন্দও যাহাকে সত্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন তাহাই সরল বালকের ন্যায় সকল লোকের সমক্ষে বলিয়াছিলেন। আর ইহার জন্য তাঁহাকে কত শত না লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা ভোগ করিতে হইয়াছিল; কিন্তু কোনরূপ প্রতিবন্ধই তাঁহাকে সত্যচ্যুত করিতে পারে নাই। ইহা দেখিয়া সর্ব্বত্যাগী কঠোর তাপস যুবা তারকনাথের কথাই তখন মনে আসিয়াছিল! বংশ, কুল, নাম, যশ, মান—সকল ঐশ্বর্য্যত্যাগী, জগত ও জগতের সকল জিনিষই যাঁহার কাছে তুচ্ছ—সেই

সত্যলাভেচ্ছু, ভগবান লাভের জন্য পথের ভিখারী, কৌপীন ও কম্বলমাত্র সম্বল যুবা তারকনাথের কথাই তখন চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিয়াছিল!

সাধারণ লোকে মহাপুরুষদের এই সকল অদ্ভূত কার্য্যাবলী দেখিয়া লাভ ও লোকসানের হিসাব করিয়া থাকে, কৃতকার্য্যতা ও অকৃতকার্য্যতার কথা—জয়পরাজয়ের কথা কহিয়া থাকে; কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় যে পরিণামে এই সকল মহাপুরুষেরাই বিজেতার গৌরব-মুকুট মস্তকে ধারণ করিয়াছেন। সাধারণ লোকে বুঝে না—apparent success is real failure এবং apparent failure is real success.দৃশ্যতঃ যাহাকে"কৃতকার্য্যতা" বলিয়া বোধ হইতেছে তাহাই প্রকৃত "অকৃতকার্য্যতা" এবং যাহাকে "অকৃতকার্য্যতা" বলিয়া বোধ হইতেছে তাহাই প্রকৃত "কৃতকার্য্যতা"। অন্তর্দৃষ্টিহীন সাধারণ লোক ইহার বিপরীতই বুঝিয়া থাকে। যাহা "কৃতকার্য্যতা" তাহাকে দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া থাকে এবং যাহা "অকৃতকার্য্যতা" তাহাকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে। জীবনের ইহাই মহা সন্ধিক্ষণ! এই মহা সন্ধিক্ষণ সকলের জীবনেই আসিয়া থাকে—প্রকৃতকে অপ্রকৃত বলিয়া বুঝা—সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বলিয়া বুঝা! জগৎ যাহাকে সত্য বলিতেছে তাহা আমার কাছে মিথ্যা এবং আমি যাহাকে সত্য বলিতেছি তাহা জগতের কাছে মিথ্যা —কি কর্ত্তব্য? এই সন্ধিক্ষণেই মহৎ লোকের মহত্ত্বের পরিচয়

পাওয়া যায়। বীর হৃদয়ের বীরত্বের নিদর্শন এইখানেই পাওয়া যায়। একদিকে সমগ্র জগত ও তাহার প্রতিকূল অবস্থা— অপরদিকে জীবনের আদর্শ! কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই— লক্ষ্য আদর্শের দিকে। আপাততঃ প্রতীয়মান কৃতকার্য্যতা বা জয়ের দিকে লক্ষ্যই নাই—লক্ষ্য আদর্শের দিকে। জগত সমর্থন করুক বা না করুক তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। জগত পছন্দ করুক বা না করুক তাহাতেও কিছু আসিয়া যায় না। যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছেন তাহার জন্য তাঁহাদের জীবন পণ! সেই জন্য দেখি—ক্রুশ-বিদ্ধ খৃষ্টের মস্তকে আজ স্বর্ণ-মুকুট, বোধিদ্রুম ছায়ায়“পা শু-পিশাচ” বুদ্ধের চরণে আজ শুভ্র কমলের অর্ঘ্য, নদীয়ার উন্মাদ নিমাই আজ সর্ব্বজনপূজ্য প্রেমের রাজা, আর দক্ষিণেশ্বরের নিরক্ষর পাগ্‌লা বামুনের বাণী শুনিবার জন্য সমগ্র জগৎ আজ উৎসুক ও শ্রদ্ধাবনত! কত শত না প্রচণ্ড প্রতাপশালী সম্রাটের হীরক-খচিত মুকুট মস্তক হইতে খসিয়া পড়িল, তাঁহাদের রত্নসিংহাসন টলিয়া যাইল —পৃথিবীর বুক হইতে তাঁহাদের বিশাল সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ পাইল! জনসাধারণ ভাবিয়াছিল তাঁহাদের প্রতাপ—অজেয়, তাঁহাদের সাম্রাজ্য—কালজয়ী! সে সকল আজ কোথায়? এই জন্য আজ বলিতেছিলাম যে, পরিণামে এই সকল মহাপুরুষেরাই বিজেতার গৌরব-মুকুট মস্তকে ধারণ করেন। তাঁহাদের জীবদ্দশায় তাঁহারা অনেক সময় সম্মান পান

না বটে, কিন্তু তাঁহাদের আদর্শের প্রতি অনুরাগ—সত্যনিষ্ঠা জগতে চিরকাল আদর্শস্থল হইয়া থাকে। ভবিষ্যতে আপামর এইরূপ জীবন্ত আদর্শ দেখিয়া,দৃঢ়চিত্ত ও সত্যনিষ্ঠ হইয়া নির্ভীক-হৃদয়ে জীবনপথে অগ্রসর হইবার অফুরন্ত সাহস ও বল পাইয়া থাকে। মৃত্যুঞ্জয়ী তাঁহারা—নিজেরা তো মৃত্যুকে জয় করিয়াছিলেনই—অপরকেও তাঁহারা মৃত্যুকে জয় করিবার শক্তি দিয়া গিয়াছেন। জগতের ইতিহাসে ইহাই দেখিতে পাই।

স্বামী শিবানন্দের ভিতর আর একটী বিশেষ ভাব দেখিতাম —ন্যায় বিচার। বিচারপ্রার্থী ব্যক্তি তাঁহার অধীনস্থ বা শত্রু হইলেও তাঁহার ন্যায্য দাবী বা অধিকার তিনি সম্পূর্ণরূপ রক্ষা করিয়াছেন। তিনি নিজের বিশিষ্ট আসনের সুযোগ-সুবিধার দ্বারা অপরের অধিকার কখনও ক্ষুণ্ণ করেন নাই। ইহাতে অনেক সময় তাঁহাকে ক্ষতিগ্রস্তই হইতে হইয়াছে; কিন্তু তিনি তথাপি ন্যায়ের পতাকা নীচু করেন নাই। যাহা ন্যায্য বলিয়া বোধ করিয়াছেন তাহাই সমর্থন করিয়াছেন। কোন প্রকার ক্ষুদ্রতাই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তিনি ছিলেন যথার্থই মহাপুরুষ—মহত্ত্বকে কখনও খর্ব্ব করেন নাই। সঙ্ঘনেতার যাহা আবশ্যক—ভালবাসা, স্বাধীনতা, সত্যনিষ্ঠা এবং ন্যায় বিচার—এ সকল গুণেরই তিনি জ্বলন্তমূর্ত্তি ছিলেন—এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। সর্ব্বোপরি প্রতীয়মান্ হয় তাঁহার সত্যনিষ্ঠা। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন,"যার সত্যনিষ্ঠা

আছে, সে সত্যের ভগবান্ লাভ করে।" আমরা এই সত্যসন্ধ, সত্যাশ্রয়ী ও সত্যনিষ্ঠ দেবমানব—যিনি সত্যের ভগবানকে লাভ করিয়াছিলেন—মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দের চরণে শত শত প্রণাম করি—আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি যেন নিজের ও দশের কল্যাণের জন্য সত্যনিষ্ঠ হইতে পারি।

বেলুড়মঠে—

জীবনের শেষ ভাগ মহাপুরুষ শিবানন্দ বেলুড়মঠেই অতিবাহিত করেন। এই সময় তিনি একটী ভালবাসার মূর্ত্তি হইয়াছিলেন। প্রত্যেক ব্যক্তি ও সকলের জন্যই তিনি বিশেষ চিন্তা করিতেন এবং তাঁহাদের কল্যাণের জন্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করিতেন। প্রত্যেক ব্যক্তিই জানিতেন, "মহাপুরুষ মহারাজ" তাঁর অতি আপনার জন—তাঁ'র নিজস্ব!

কয়েক হাজার ব্যক্তির মানসিক দুঃখ কষ্টের ভার তিনি বহন করিতেন, যেন একটী ছোট-খাট ভালবাসার রাজ্য তিনি চালাইতেন। তিনি প্রকাশ্য কর্ম্মী ছিলেন না, কিন্তু তিনি ছিলেন নির্লিপ্ত নিঃসঙ্গ কর্ম্মী। সাধারণতঃ, কর্ম্মী বলিতে বুঝায়—যিনি বহুপ্রকার চাঞ্চল্যকর কার্য্য করিতেছেন; কিন্তু জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ শিবানন্দ নির্লিপ্ত ও নিঃসঙ্গ হইয়া, তাঁ'র ভালবাসা ও হৃদ্‌গত শক্তি দিয়া অপরের নিজস্ব ভাবটী—অপরের নিজস্ব কর্ম্মের ভাবটী জাগ্রত করিয়া দিতেন। তিনি স্থির হইয়াও

চঞ্চল ছিলেন; একস্থানে থাকিয়াও সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেন; বিশেষ কোন চিন্তা না করিয়াও চিন্তা করিতেন।

ভালবাসা ছাড়া তাঁহার আর একটা শক্তি—যাহার বিষয় পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে—উদ্ভূত হইয়াছিল—গুণাতীত জ্ঞান বা অতীন্দ্রিয় জ্ঞান (snper-sensuous knowledge)। তর্ক, যুক্তি, বুদ্ধি ও বিবেচনার দ্বারা মানুষ যতটা উঁচুতে উঠিতে পারে জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ শিবানন্দ তাহার বহু উর্দ্ধে উঠিতেন। তাঁহার সেই অবস্থার কথাগুলি এমনই মিষ্ট ও এমনই সত্য হইত যে সেখানে বিচার বুদ্ধি চলে না। তিনি জগতকে ও সৃষ্টিকে অন্য এক স্তর হইতে, অন্য এক চক্ষে দেখিতেন। সাধারণ লোকে যেমন জগতকে কারণ-অন্তর্গত দেখে তিনি সেইরূপ দেখিতেন না। তিনি কারণ-অতীত অবস্থা হইতে জগতকে দেখিতেন। এই জন্য, তাঁহার কথাগুলি এমন মিষ্ট ও সারগর্ভ হইত। উদাহরণ স্বরূপ তাঁহার দুই একটী কথা বলিতেছি। তিনি বলিয়াছিলেন, "দেহ থাকিতে সম্যকরূপে পূর্ণত্বের জ্ঞান হয় না। দেহ ত্যাগ করিলে সম্যক পূর্ণত্বের জ্ঞান হয়।" কথাটী অতি সত্য; কারণ দেহ থাকিলেই খণ্ডত্বের জ্ঞান থাকে এবং যতই মুখে বলা যাক না কেন সম্যক্ পূর্ণত্বের উপলব্ধি হয় না। আর একটী কথা তিনি বলিতেন, "আনন্দময় জগৎ —সর্ব্বত্র আনন্দ দেখ্‌ছি; আমি মহা আনন্দে আছি, তবে দেহটা বড় জীর্ণ হ'য়েছে, মাঝে মাঝে গোলমাল করে। তা ঐ

দিকে মন না দিলেই হয়। দেহটা যা ইচ্ছে হয় করুক। আমার মনটাকে ওর জন্য চঞ্চল কর্‌বার আবশ্যক নেই।" এই কথাটী কি উচ্চ অবস্থার কথা! দেহ হইতে মন বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে; জগতের ভিতর ভেদ, পার্থক্য, দ্বন্দ্ব বা বিপরীত ভাব যাহা, মন তাহার অতীতে চলিয়া গিয়াছে—"দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশম্।"

মন যখন নিম্নস্তরে থাকে অর্থাৎ যখন দেহের মাংসটার সহিত বিজড়িত হইয়া থাকে, তখনকার মনের অবস্থাকে "কামলোক"—বাসনার ক্ষেত্র (Region of Desire) বলে। মন তাহার উপর উঠিলে—নিতান্ত স্থূল দেহের সম্পর্ক হইতে কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে উঠিলে তাহাকে "রূপলোক" (Region of Forms) বলে। এই স্থান হইতে মন কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে উঠিলে তাহাকে "ভাবলোক" (Region of Ideas) বলে। তদূর্দ্ধে মন উঠিলে তাহাকে "জ্ঞানলোক" (Region of Knowledge) বলে। "ভাবলোকে" মন থাকিলে ব্যক্তি বা সাধক কবি হইতে পারে এবং "জ্ঞানলোকে" মন উঠিলে ব্যক্তি বা সাধক দার্শনিক হইতে পারে। এই হইল সাধারণ লোকের মনের গতি; কিন্তু এই স্থানে দ্রষ্টা ও দ্রষ্টব্যের ভিতর ব্যবধান বা পার্থক্য আছে। ইহার পর, মন আরও উর্দ্ধে উঠিলে দ্রষ্টা ও দ্রষ্টব্য, "অহং" ও "ইষ্টম্" বা ব্রহ্মণ একীভূত হইয়া যায়—আর ব্যবধান বা বিচ্ছেদ থাকে না। এই স্থানকে "আনন্দময় লোক" (Region of Bliss)

বলে। মনের আরও উর্দ্ধগতি হইলে "আনন্দময় লোক" হইতে আর একটী চরম অবস্থায় পৌঁছায়—তাহাকে "অনুত্তর, সম্যক, সম্বোধি" বা "পূর্ণ পরজ্ঞান" (Complete and Final Knowledge) বলে। ইহা নির্ব্বিকল্প সমাধির অন্য এক রূপ। এই অবস্থার কথা কেহ কখনও প্রকাশ করেন নাই এবং মন ও ভাষা দিয়া কখনও এ অবস্থা প্রকাশ করাও যায় না।

মহাপুরুষ শিবানন্দ পূর্ব্বকথিত "আনন্দময় লোকে" মনকে সর্ব্বদাই তুলিয়া রাখিতেন। জীবনের শেষভাগে যাঁহারা তাঁহার কথাবার্ত্তা, ভাব ভঙ্গী বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা অনুভব করিয়া থাকিবেন যে, তিনি অধিকাংশ সময় এই "আনন্দময় লোকেই" বিচরণ করিতেন। বিদেহ না হইলে কেহই এই অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারেন না। ইহা হইল জীবন্মুক্ত পুরুষের বিশেষ লক্ষণ। মহাপুরুষ শিবানন্দ এই "আনন্দময় লোকে" অবস্থান করিতেন বলিয়াই সমস্ত জগতকে আনন্দময় দেখিতেন। এই জন্য, জীর্ণদেহে নানাপ্রকার কষ্টের মধ্যেও তিনি সর্ব্বত্র "আনন্দ" বা "ব্রহ্ম" দেখিতেন।

এস্থলে বুঝিতে হইবে যে, যে আনন্দ আমরা উপলব্ধি করিতে পারি বা ব্যক্ত করি সে আনন্দ দেহজ; কিন্তু মহাপুরুষ শিবানন্দ যে আনন্দ উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহা সৎ, চিৎ, আনন্দের। সে অবস্থায় মাত্র আনন্দের অংশটুকু প্রকাশ করা যায়। চিৎ অবস্থায় মন যাইলে মনের বৃত্তি, চঞ্চল ভাব বা

স্পন্দন তিরোহিত হয়। মন তদূর্দ্ধে উঠিলে সৎ বা ব্রহ্মে লীন হইয়া যায়। সৎ অব্যক্ত ও স্বয়ং। এই দুই উচ্চ অবস্থার বিষয় কেহই প্রকাশ করিতে পারেন না—কেবলমাত্র বিকাশমুখী আনন্দ অল্পবিস্তর প্রকাশ করিতে পারেন। এই জন্য, জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ শিবানন্দ জগতকে আনন্দময় ধাম দেখিতেন; কিন্তু স্বয়ং তদূর্দ্ধ অবস্থায় চলিয়া যাইতেন। সে অবস্থা প্রকাশ করিবার নয়। "সৎ, চিৎ, আনন্দের" এক অংশ তিনি জনসমাজের কাছে ব্যক্ত করিতেন, অপর দুই অংশ তিনি নিজেই হইয়া যাইতেন; কারণ সেই অবস্থা বাক্য-মনের অতীত—"অবাঙ্‌মনসো গোচরম্‌"।

লোকান্তরে—

এই জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ শিবানন্দ বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ৮ই ফাল্গুন (ইং ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ, ২০শে ফেব্রুয়ারী) মঙ্গলবার, অপরাহ্ন ৫-৩ মিনিটের সময় দেহত্যাগ করিয়া মোক্ষধামে চলিয়া যান। এই সময় তাঁহার বয়স অশীতি বৎসরের উপর হইয়াছিল। তাঁহাকে প্রণাম—প্রণাম—প্রণাম ॥

ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি!! ওঁ শান্তি!!!

শিব ওঁ।